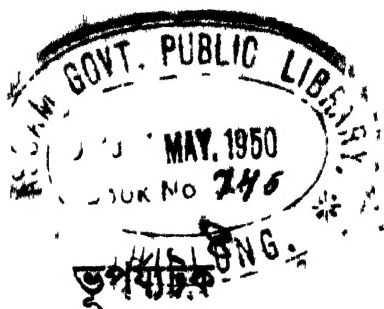


ভবঘুরের বিলাত যাত্রা



রামনাথ বিশ্বাস

2024
- 8.8.2

মিত্র ও ঘোষ

১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

এক টাকা বারি

জীবন মরণ নিয়েই মানুষের পরমায়ু। এ সংসারে
 কারো সারাজীবন সুখে কাটে আর কেউ হা-ছতাশ কবে
 জীবন কাটায়। গৌরীশচন্দ্র সিংহরায় তার প্রথম জীবন
 হা-ছতাশ করে কাটিয়েছিল। পরে যখন বুঝল এই
 হা-ছতাশের কারণ কি এবং সে কারণটাকে সরিয়ে দেবার
 জন্য উঠেপড়ে লাগল তখন দেখল তার শরীরের জীবনীশক্তি
 ফুরিয়ে গেছে। সেজন্য সে মোটেই দুঃখিত হয়নি বরং দুঃখ
 করতে নিবেদন করেছিল। পৃথিবী হ'তে হা-ছতাশ যাতে
 জোপ পায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য অনেককে বলেছিল।
 তার উপদেশ বাণী হতে আমিও বাদ যাইনি। আমার
 কর্মকর্মতা ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে সেজন্য তার ভ্রমণ কথ
 লোকেই সকল কাজের পরিসমাপ্তি করছি।

প্রস্তুকার।

গল্প তোমরা সবাই পড়েছ। কিন্তু এমন অনেক গল্প আছে যা পড়ার পর একবার সকলকেই ভাবতে হয়, কি পাঠ করলাম। অবশ্য আজ তোমাদের কাছে যা বলব তা ঠিক গল্প নয়। মাকে মাঝে আমার ভ্রমণের স্মৃতিতে দেখি কত কি, আবার কখনও মনে পড়ে অতীতকালে কত কি কাহিনী। পারি না চূপ করে থাকতে, অবসর সময়ে সেই সব গল্প বলি। আমার জীবনের শেষের দিকটা কেমন করে কেটেছে তাবই কথা বলছি। মরণ বোধ হয় আমার সন্নিহিত এসেছে। আমি নাক দিয়ে আর শ্বাস ফেলতে পারছি না। দুখ দিয়েই শ্বাস নেওয়া এবং কথা বলার কাজ চলছে। অসুস্থি মাথাটা এখনও খারাপ হয়নি। জ্ঞান ঠিক আছে বলেই আমার ধারণা। আমি স্বজ্ঞানে আছি কি জ্ঞান হারিয়েছি তা জানবার জন্য প্রায়ই দু'একটা অংক করি। খবরের কাগজ পড়ি, রেডিওতে কলকাতার সংবাদ শুনি। আর যদি কোন বাঙালী ভ্রমলোক দয়। আমার দেশের কোনো সাপ্তাহিক অথবা মাসিক এনে দেন তবে তারও পাতা উন্টাই।

পৃথিবীর বড় বড় শহর দেখেছি, বড় নদী সমূহ পেরেছি, বারি পথের বিবিধ বিচিত্র অবস্থার, তা তুলিনি কিছুই। তার প্রত্যেকটার ছবি এখনও আমার স্মৃতি-পথে আগ্রত, হুস্পষ্ট, সজাগ আছে। কি দেখেছি এবং কি করেছি তার অবিকল বর্ণনা আমার বরের অজ্ঞাত রোগীদের প্রায়ই শুনাই। যার হাতে আমার পরিচর্যার তার পড়েছে তিনিও আমার কাছে বলে এই তব্বুরের দেশ ভ্রমণের কথা শোনেন এবং মাকে মাকে তার নোট বইয়ে কিছুটা লিখে নিয়ে যান।

আমার এ গল্প গল্প নয়, জীবন বেদ। আমার ভ্রমণ কথায় কথায়ই কলকাতা পারলেই লিখি, কারণ যা দেখলাম

ভবনুবেৰ বিলাত যাত্ৰা .

চাই না, ভুলতে পাৰি না। থেকে থেকে মনে হয় পৃথিবীৰ তাবৎ লোককে যদি দেখতে পাবতাম—জগতৰ সকল দেশ! তা ত' হয় না। সে জন্ত লিপতে চাই, বলতে চাই আমাৰ কামনা বাসনাব সেৱা অল্প কি ' পায়ই মনে হয় আমাৰ এ লেখা কে ছাপানে ' এখানে যাদেৰ সঙ্কে আমাৰ অন্তঃসংগতা ভাবা আমাৰ লেখাৰ দিকে একটুও তাকায না। আনাব এ দেশ-দেখা মনেন সঙ্গ এদের কাণও নেই পৰিচয়, জানে না এৱা যে মাছুৱেৰ বাচাৰ সাধকতা কোথায়, এৱা শুধু ভাবে আমাৰ মৃত্যুৰ কথা। এৱা এসেই আমাৰ মুখেৰ দিকে চেয়ে থাকে আৰ তাৰ পবই মুখ কিৰিয়ে কেউ চোখেৰ জল ফেলে আৰ কেউবা একট কথোও না বলেই চলে যায়। তাবা হয়ত ভাবে আমি আজই মৰব বা পৰেই মৰব। তাৱা হয়ত ভাবে কি কৰে আমাকে কবৰ দেৱাৰ স্বন্দোবন্ত কৰবে।

তাদের হাবভাব দেখে আমি মনে মনে বলি আমাব মৰা-বাঁচাব ক্ষমিষ আমাৰ তাতেই থাক, তোমাদের তা নিয়ে অন্ত দরদ দেখাতে হবে না। মৰবাৰ জন্ত পৰোয়া কিছু নেই, কাৰণ মৃত মানব-শৰীৰেৰ বেশ চাহিদা আছে। ইচ্ছা কৰেই এৱা মৃত মাছুৱেৰ শৰীৰেৰ সেয়াব মাৰকেট কৰে না। যদি কেউ এই মাল নিয়ে লওনে একট দোকান খোলে তবে সেই দোকানেৰ সেয়াৱেৰ দাম বাঢ়ত ছাড়া কমত না। এটা ভাৱতবধ নয় এটা ইংলণ্ড এবং বিশেষ কৰে লণ্ডন। এখানে লোক কুকুৰ বিড়ালেৰ মত পথে-বাটে মৰতে পাৰে না। এখানে লোক হাসপাতালেই মৰে। বাৱা পথে-বাটে মৰে তাৱা মৰে ছুটনায। অন্ত কোন কাৰণে নয়।

অতঃপৰেই বলেছি যে আমি আমাৰ জীৱনেৰ জন্ত পৰোয়া কৰি না। শুধু ভাবনা আমাৰ এই লেখা নিয়েই। সেয়াটোৱা কি পতি হয়ে

ভবঘুরের বিলাত নাম্বা

তাই নিয়ে আমি একটু চিন্তিত হয়েছিলাম, হঠাৎ আমার আশা ছিল একটু, তোমাদের ভবঘুরে রামনাথের সংগে আমার দেখা হবেই। হয়ে ওঠিল। তিনি সহস্র আমান কাছে আসেন নি, বিপদে তাকে টেনেছিল। ১১৮০ গ্রামার জন্ম তিনি বেশ পরিচয় করেছিলেন বিপদই ঠিক আমার কাছে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। যাক-গ—তিনি কি করে আমার কাছে এসেছিলেন সে কথা তাঁর মুখ থেকেই তোমরা শুুন নিও এখন আমার যা বলবার আছে তাই আগে শেষ করি। আকাশ পালল কহ কি যে ভাবছি তাব কুল কিনাব নেই, তঠাৎ মনে হ'ল য'কে যেন বলছে, “গৌরীল ভাল আছ?”

তখন একবারও মনে হয় নি যে তোমাদের ভবঘুরে রামনাথ সতাই আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ভাবছিলাম, হঠাৎ স্বপ্ন দেখছি। উঠে বসলাম।

একটা ভিজে কমাল দিয়ে চোখ মুছলাম, তাবপর ভাল করে চেয়ে দেখি সত্যি-সত্যিই সেই ভবঘুরে গম্ভীর হয়ে আমার কাছে দাঁড়িয়ে। অনেকগুলি রোগী তার দিকে চেয়ে আছে। আমি বললাম, তাকিয়ে আছে ওরা কিন্তু কেই বা জানে আপনার অস্থির বেঁটে পা দুখানার মূল্য। আপনার আগেই আমি দুবার পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে এখানে এসেছি। অকলসি তিক্ত করে খরচ চালাচ্চেন, আর আমি গভীর খাটিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করছি। আন্তন, বন্তন, কাছে এসে বসুন।

তোমাদের ভবঘুরের হাতটা টিপে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম নিচেরই কত হয়েছে?

ভবঘুরে হাসলেন, একবারও বললেন, তোমরা, যেন 'হুদী' হলো।

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

আমাব' মত আধমব' মাত্বে যদি তাঁর হাতে চাপ দেয় তবে তার কি হতে পাবে' কিছুই না, তবুও যখন আগি বললাম কষ্ট পেয়েছেন কি' তখন তার হাসাই উচিত ছিল। তিনি তাই করেছিলেন। সোদন তাঁর সংগে আর বিশেষ কোন কথা হয়নি তাই আগামী রবিবারে তাকে আসতে বললাম। মনে হল এতদিনে মনের মানুষ পেয়েছি। তিনি এসেও ছিলেন। তিনি শুধু একদিন আসেন নি, যতদিন লগ্নে ছিলেন সপ্তাহে দুবার করে আসতেন। ভগবান আজ আমাব শেষ জীবনের আশা মেটাবার জন্য তাকে পাঠিয়ে দিলেন তাকে ত সহজে ছেড়ে দেব না। জীবনের সঞ্চিত মণ্ড অভিজ্ঞতা, তা সে যতটুকুই হোক আগি নিঃস্ব রিক্ত হয়ে দিয়ে দিতে পারি এমন মানুষ রামনাথ ছাড়া আর কেউ নেই। তাই তাকে আমার ভ্রমণ কাহিনী শুনিযেছি। তিনি মন দিয়েই শুনেছেন। লেখাটা তাঁর কাছে দিয়েছি। তিনি বলেছেন, সময় পেলেই আমার ভ্রমণ কাহিনী তিনি নিজে লিখে ছাপাবেন। তিনি আমার ভ্রমণ কাহিনী নিশ্চয়ই ছাপাবেন, আর দেশের লোক তা পড়বে। আমি সেই আনন্দ নিয়ে আসতে পারব বলেই তোমাদের ভবঘুরে বিদায়ের বেলা অনেক কথাই বলেছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এসব কথা অপহারী ভাষা-প্রবণতার প্রভাবে তাঁর মুখ হতে বের হয়নি। সত্যিকারের লোক সত্যি কথা বলেই আমার কাছ হতে বিদায় নিয়েছিলেন।

তোমরা অনেক লোককে মরতে দেখেছ, অনেককে চিরজবে বিদায় নিয়ে বিদেশে যেতে দেখেছ। মানুষকে কীভাবে ভবঘুরে তোমাদের ভবঘুরে যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন,

ভবঘুরের বিলাস বাজ

তখন দীপনিঃখাল কেলেন নি, আব আমিও কাঁদিমি। আমিও হাসি মুখেই একে অল্পকে নিদায় দিবেছিলাম। কেন আমরা হাসতে পেরেছিলাম জান! আমি আমার কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করেছি সেই জন্যই সবতে অথবা চিরন্তনে নিদায় নিঃখ কোন দুঃখ হয়নি, আর তোমাদের ভবঘুরে জীবনও একজন কাজের মেশিন। কাজ করে যাওয়াই হল তাঁর জীবনের লক্ষ্য, অতএব তাঁর মুখও সদা-সর্বদা হাসিতে পরিণতসে সজীব ও উজ্জল থাকবে। কাজ কণা দেখবে তোমরাও হাসতে পাবছ, তোমরাও মরণকে ভয় দেখাচ্ছ, দেখতে পাবে যারা তোমাদের ভয় দেখাচ্ছে তারাই ভীত হয়ে পালাচ্ছে। হুনিয়াতে যদি বেঁচে থাকতে চাও, তবে মনে-প্রাণে সব সাধারণের কাজ কর, দেখতে পাবে তোমরাও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছ। তোমাদেরই কবি গেয়েছেন।

বল বীর উন্নত মন শির

... ..

এখন আমার আসল কথাটা বলি। আমার বেশ হল কোলকাতা জেলায়, আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তখনকার দিনে কোলকাতা ঘরের ছেলের অনেক কর্তব্য ছিল। আমিও সেই অনেকে পালন করতে বহু পরিকর করেছিলাম। ছলে-বলে কলকাতার পরিবারের গৌরব বজায় রাখাই আমার একমাত্র কর্তব্য ছিল। সেই কর্তব্য বজায় রাখতে গিয়েই বেশী আয়ের জন্য কলকাতার, আমি ভেবেছিলাম কলকাতার পথে ঘাটে টাকা হড়ানো রয়েছে। কিন্তু যেদিন কলকাতার আসলাম, দেখতে পেলাম কলকাতার টাকার বদলে দুটি বাটি ছড়িয়ে থাকত সবুও বেশ ভাল হয়। কলকাতার টাকা মিনি হচ্ছে দেখে মাথাটা বিগড়ে গেল, আমি আমার ঘরে আসতে

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

জন্ম চেষ্টা করতে লাগলাম। তখনকার দিনে ভদ্রলোকের পক্ষে ছোট-খাট চাকরি গ্রহণ করাটাও বদনামের কাণ্ড ছিল। তখনকার দিনে বড় চাকরি মানেই ছিল কেবাগীর কাজ। আমি কিন্তু কেবাগী গিরিটা মনে-প্রাণে গ্রহণ কবতে পাবি নি। বিদেশে গেলে যদি অল্প কাজ সহজে পাওয়া যায় তাব অস্বেষণে কলকাতার নানা যায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

ভদ্রলোক অর্থাৎ কেবাগী শ্রেণীর মানুষেরা পাছে লোকেব উপকার হয় এই আশঙ্কায় সর্বদা শঙ্কিত। তাই তাদের কাছে কোনো কথা জানানতে চাইলে এড়িয়ে যায়, যাও বাল তা অতি সামান্য, তা হ'তে হুদিস পাওয়া যায় না কিছুই। আমি কেবাগী মহলে বার বার চেষ্টা করেও বিদেশের কোন সংবাদ পেলাম না। যাবা যুদ্ধে যাচ্ছিল তারা কি কাজে কোথায় যাচ্ছে তারও হুদিস পাওয়া কষ্টকর ছিল। একদিন বেপরোয়া হয়ে খিদিরপুরের খালসী মহলে যাওয়া-আসা করলাম। একমাত্র আশা এই যে, ওরা ভদ্রতাব মুখোস পরে না, তাহলে সন্ধ্যাবেলাতে ওদের সন্কোচ হবে না। আমাব সে আশা মিথ্যা হ'ল। কারণ ওরা সহজে মন খুলে দেশ বিদেশের কত কথাই বলত। তাদের অপূর্ব দেশ ভ্রমণ স্তনতাম খখন তখন মনে হ'ত যে ওদের সংগেই বিদেশে যাই না কেন। তাদের কাছ হ'তে জানতে পারি যে খখন ভদ্র সমাজে আসতাম তখন আবার মনের পক্ষি বসত। ভাবতাম এদের সংগে বিদেশে গেলে কি মান ইজ্জত থাকবে? মান ইজ্জত বজায় রাখার জন্যই কলকাতায় এসেছি। মান ইজ্জত যাতে বজায় থাকবে না সেদিকে যাওয়া কি উচিত? এই ভদ্রতা আর সত্যের দোটারায় কাটল কিছুদিন, তারপর একদিন খিদিরপুরে যাওয়া শুরু করলাম।

ভবঘুরের দিলাত বাজা

অনেক দিন চলে গেছে। বিদেশে পাবার আশা পাব মন হ'তে লোপ পেতে বসেছে। কলকাতায় থেকে কোনমতে দিন কাটিয়ে পৈতৃক প্রাণটা বাবে বাবে কবছে, এমনি যখন আমার শরীরের অবস্থা তখন দেখা হল আমাদের দেশের ভ্রমলোকের সংস্পর্শে। ভ্রমলোক বড়ই অস্বাভাবিক এবং দণ্ডিতের পক্ষ। তাঁকে দেখে আমার মনের সাগর দোলার ঢেউ মেনে উঠাল হয়ে উঠল। মনে হ'ল এই বুঝি শেষ, এ স্তব্ধতা আর ছাড়া হবে না—আমাকে যেতেই হবে। কলকাতার এই নিত্যদিনের একঘেয়ে জীবন আর পারি না সহ্যে। গাইরেব বিচিত্র জীবন-যাত্রার স্বপ্ন, দেশ দেখার কল্পনা কলাঘাস-মেগেলেন-ড্রেকের ইতিহাস, পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিচ্ছায়া যেন আমার এই জীর্ণশীর্ণ মনে হঠাৎ একঝলক প্রতিবিম্বিত হয়ে আমাকে পাগল করে তুলল। যাব আমি, যাবই। সে ভ্রমলোককে ভগবানের দূত ব'লে মনে হ'ল—আমি ধরে বসলাম, আপনি ত যাচ্ছেন, আমাকে নিয়ে চলুন।

বাজা শুরু হল,—বন্দোপসাগর, আমাদের ঘরের কলকাতাকে, বলি সেই সমুদ্রে।

কলকাতা হতে বেহিন রওয়ানা হই সেদিন বিকাল বেলায় উঠেই পাকের বন্দোবস্ত করি! ভাঙ্গা মুগের ডাল, ইন্ডিয়ান কোল আর দেশী চালের ভাত পাক করেছিলাম। আমার সাথীদের সংস্পর্শে টিক হয়েছিল, সন্ধ্যার পরই খাওয়া হবে। দেখতে দেখতেই সন্ধ্যা হল। খাবার সময় হয়ে আসল। এদিকে আহাজও পাক হইয়া গেছিল। ছেড়ে সাগরে পড়ল। জ্যেষ্ঠ মাস সারাটাদিন পরনে খা খা করেছিল। হঠাৎ দক্ষিণের আকাশে মেঘ দেখা দিল। মেঘ সাদাই ছিল, তারপর কালো হল। তার ঘনঘটার আকাশ হ'ল অন্ধকার।

ভবঘুরের' বিলাত যাত্রা

ঝড় উঠল। ঝড়ে জাহাজ কেঁপে উঠল, তারপর কি হল জানি না। ডেক থেকে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মাথা ঘুরতে লাগল। পেটে কিছুই ছিলনা বলে বমি হল না, তবে উঠবার আর ক্ষমতা থাকিল না। খাবার ইচ্ছা হওয়া দূরের কথা খাবার কথা মনে হবা মাত্র শরীরটা বেন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। নিজে হাতে রাঁধা ডাল ভাত আর মাছের তরকারী মুখের কাছেই পড়ে রইল। জীবনে যে আর কখনও খাবো এমন মনে হয় না, আশে পাশে বার। শুয়েছিল তাদের অনেকেই বমি কবছিল। ঘণ্টা খানেক এরূপ দৃশ্য দেখার পর আপনি চোখ বুজে আসল, তারপর আর কিছুই জানি না। যখন চোখ খুললাম তখন দেখলাম আমাদের জাহাজ আর একটি গংগার মুখে মন্থর গতিতে চলেছে একটা পাগোডা সামনে রেখে। মনে পড়ে গেল সেই ডাল ভাতের কথা। আশু আশু উঠে দাঁড়ালাম। ডাল ভাতের অবস্থা দেখলাম, তারপর আর তার দিকে চাইতে ইচ্ছা হল না। আমার ভ্রমণের শুরুতেই রাঁধা ভাতে ছাই পড়ল। কুসংস্কার আমার মনে ছেয়ে বসল।

তারপর পিনাং সিংগাপুরের অনেক স্থানে অনেক বৎসর কাটিয়েছি, কেউ আমার মুখে হাসি দেখেনি। আমার সংগে বেন দুর্ভাগ্য ভুরতো আমার বলত তোমার রাঁধা ভাতে ছাই পড়ছে, তোমার জীবনে সুখ শান্তি নাই।

প্রায় নয় বৎসর মালয় দেশে কাটিয়ে মালয় এবং জাম ভাবায় বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। একটা দ্রাকুরিও যোগাড় করেছিলাম, ভাতে বেশ ভাল বাইনেই পেভার, কিন্তু সেই প্রথম দিনের কুসংস্কার আমার মনে এখনি করে দাগ কেটেছিল, মনের শান্তি চলেগিয়েছিল। আমি নিঃসংগ একাকী থাকতেই ভালবাসতাম। জীবনটা এক যন্ত্রণা

ভবঘুরের বিলাসে বাণী

হয়ে উঠেছিল, বেঁচে থাকতেও আর ইচ্ছা হ'ত না। খাওয়া এবং
তবে খাওয়া অথবা ঘুমের ঘোরে অচেতন হয়ে থাকা এই ক'রাটি
কাজে কিন্তু কোনও দিক দিয়ে কম ছিল না। তবে কেন আমার
এই দুর্ভাগ্য ভাব কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমার নিঃশব্দ জীবনের
সবচেয়ে বড় অভিযাপ আর অশান্তির মতো ১১ অস্ত্রাণ্ড রহস্য আত্ম-
গোপন করে শাসা বেঁধেছিল তা এখন বুঝতে পারিনি।

শ্যামদেশের গভীর জংগলে

আমাদের দেশের লোকদের ভৌগোলিক জ্ঞান বড়ই কম সেজন্য
তারা আফ্রিকার জংগলের কথাই বেশী কবে বলেন। তারা জানেন
না, আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ হতে আরম্ভ করে ব্রহ্ম দেশের
পশ্চিম দিকে এক লম্বা গভীর জংগলে পরিপূর্ণ পর্বতমালা হিমালয়
হতে বের হয়ে ব্রহ্ম দেশের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত চলে হঠাৎ সাগর জলে
ডুব দিয়েছে। এই গভীর জংগলের বিশেষত্ব আছে এইকি। কোথাও
পর্বতমালা বড় বড় গাছ-পালার মধ্য দিয়ে পার হয়ে হঠাৎ একটা
জলাভূমিতে শেষ হয়েছে, আবার বিচিত্র বৃক্ষ-মালায় পরিণোভিত
হয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। এই পর্বতমালার উপরিভাগে বেঙ্গল
দামী দামী গাছ পালা দেখতে পাওয়া যায় তেমনি তার নীচে
নীচে নানা রকমের মূল্যবান ষাভব পদার্থ পাওয়া যায়, একটাই
কারণ উপদ্বীপ পৃথিবীর সেরা দেশ বলে গণ্য। কলকাতা হতে
চলে আসবার পর আমি হালদা দেশের প্রায় সবটাই বেড়িয়ে

ভবঘুরের বিলাত রাজ্য

হিলাম। এবার আমি এসেছি এমন এক স্থানে, যার সঙ্গে পৃথিবীর কোন সন্ধ আছে বলে মনে হয় না। পুকিট নামক স্থানে তংকা বলে একটি বন্দর আছে। এই বন্দরে ব্রিটিশের পরিচালিত ছ'বাক্সা টিমার সপ্তাহে ছ'বার করে যাওয়া-আসা করে। সেই জাহাজেই আমি তংকা বন্দরে এসে পৌঁচেছি। তংকা বন্দর আয়তনে চট্টগ্রামের সমান এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়ে চট্টগ্রাম হতেও বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তংকা হতে একটা বড় রাস্তা পূর্বদিকে আগিয়ে গিয়ে শ্রাম দেশের মেন্-ল্যাণ্ডের কাছে শেষ হয়েছে। ফেরিতে সেই ছোট প্রণালীটি পার হলেই আরম্ভ হয় বিস্তীর্ণ জলা-জংল; যাকে আমি গভীর বলেই বর্ণনা করব। এখান হতে আরও পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে গিয়ে একটি গ্রাম পাওয়া যায়, সেই গ্রামেই থাকতাম। গ্রামের চারিদিকে গভীর জংল। সে জংলে জংলী হাতি, বাঘ, নাপ, এবং অজস্র সব রকমের নর-যাতক জীব-জন্তু বাস করে সন্ধ্যার পর এক ঘর হতে অল্প ঘরে বেতে হলে শুধু মশাল জালিয়ে বেগ হলে নিরাপদ বলে মনে হ'ত না। কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র সংগে থাকলে তবে অনেকটা নিরাপদ বলে মনে হ'ত। এরূপ স্থানে আসার জন্য আমার মন আবৃত্তি খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

দিনের বেলাতেও গ্রামটি আমার কাছে নিরব এবং নিঃশব্দ বলেই মনে হ'ত। এরূপ নিরবতা পেয়েও আমি দিনের বেলায় কোন বই পড়তাম না। রাজ্যেই বই পড়াটা আমি পছন্দ করতাম।

১৯২৯ সালের জুলাই মাসের শেষ ভাগে আকাশ অন্ধকার। অন্ধকার ঘরে বসি পড়ি। রাজি গভীর। কি একটা পক্ষ ভরে আসার শব্দ ভেঙে গেল। শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে তাহি কিছু জানা যায় না। রাজ্যেই বই পড়লাম। জেগে উঠে দেখি

ভবদুয়ের বিলাস বাজা

থেকে বার বারে চিংকার করে জিজ্ঞাসা করতে এটা কিশের শব্দ হ'ল ?
 ভায় দেশে সেঙ্গপ কেউ করেনা। ভায় দেশে এখনও সর্বসাধারণ
 তাদের ইচ্ছাকৃত পিষ্টল, বন্দুক, খাঁড়া এবং অন্যান্য নানা রকমের অস্ত্র
 বারে ঘেঁষে ব্যবহার করতে পারে। এতে চোর ডাকাতের যেমন
 সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। লোকদের যেমন
 কারণ থাকে তেমনি লোকের স্তব্ধ সুবিধারও পথ খোলা থাকে।
 আমাদের দেশে যদি কোন ধনীলোক কোন গরীবকে সাহায্য করতে
 চায় তবে তার লোকবলের দরকার অতি অল্পই হয়। বিচারালয়ের
 সাহায্যেই তাদের শত্রুকে আইনের প্যাঁচে কেল জব্ব করতে হয়।
 কলে বার পয়সা নেই, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা পোষায় না।
 কিন্তু ভায় দেশে তা হবার উপায় নাই। মামুলী মজুর অথবা কৃষকও
 হরকার হলে অস্ত্রের সাহায্যে প্রবল পবাকান্ত শত্রুকে গোপনে হত্যা
 করে প্রতিশোধ নেয়। এই যে শকট গুনতে পেলাম তা যদি সেঙ্গপ
 কিছু হয় অর্থাৎ কেউ যদি কাউকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়ে
 থাকে তবে সেই কাজে আমার নাক-গলানো কোন মতেই উচিত
 হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বারা নাক-গলাতে বার তাদের নাকের
 বদল কুহুস্ কেটে এবং এক বলক রক্ত মুখ থেকে বার হয়ে তার
 চিরন্তরে সংসার হতে বিদায় নেয়। আমাদের বাংলা দেশে একটা
 প্রচলিত কথা আছে, সেই কথাটা হল “অমুক লোকটার পেছাই হল
 মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া”। ভায় দেশে তা হবার উপায় নাই। ভায়
 যে লোকটা কারো দ্বিগুণে অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এল, কাল
 তার শাস্তি পাবে। আর কোন মতেই নিরাপন্ন নয়। তাকে অমুক
 লোকের ঘরতে হয়। এরূপ অনেক ঘটনা ঘটবে বলেই কেউ কারো
 মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাহস করে না।

ভবঘুরের বিলাত ধাঁড়া

বাই হোক—যুম থেকে ওঠার পর সেই শকের কথা মনে হ'ল। সেজন্ত ভাড়াভাড়ি করে চায়ের দোকানে গেলাম। চা দেবার সংগে সংগেই বলল “তোমাদের মিটার মরিশন আত্মহত্যা করেছে, একবার গিয়ে দেখে এসনা।” কথাটা শুনেই গত বাজের শকের তথ্য বুঝতে পারলাম! চা খাওয়া হয়ে গেলে মরিশনের বাংলাতে গিয়ে দেখলাম মরিশনের বন্দুক মরিশনের বুকেব উপর পড়ে আছে আর মরিশনের মাথার খুলি উড়ে গিয়ে দেওয়ালে লেগে রয়েছে। বরটা বক্তে রক্তাক্ত হয়েছে। মরিশন আমাদের কোম্পানিতেই কাজ করত, সেজন্ত আমাব কর্তব্য হল মরিশনের মৃত্যু-সংবাদ সিংগাপুরে জানানো। এসব কাজে যখন ব্যস্ত ছিলাম তখনই আমার দেখা হয় তোমাদের ভবঘুরে রামনাথের সঙ্গে। রামনাথও এদিকে এসেছিলেন লংবাড়ী কাজ নিয়েই। তাঁব সংগে কয়েকদিনের দেখা-সাক্ষাতের কালে আমার মনের পরিচিন হয় এবং তিনি আমাকে সিংগাপুরে ফিরে যাবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন।

অপরের কাজ করলে নিজের ইচ্ছা মত কোথাও বাওয়া-আসা করা যায় না। সিংগাপুর ফিরে যাবার জন্য কয়েকবারই ‘আবেদন নিবেদন করলাম।’ বার বারই আদেশ আসতে লাগল কর্তৃকর্ত পরিত্যাগ করলে কাজ হতে ডিসমিশ করা হবে। বাংগালীর প্রাণই হল চাকুরি। সেই কাজ পরিত্যাগ করা আর শরীর হতে আত্ম-গামকে ঠেলে বার করে দেওয়া একই কথা। আমি কেবলই করত তাই অবস্থিলাম। আর একটা চাকুরী বোনাড় করাও সম্ভব না। সাধ্যাভীত ছিলাম। তখন ছিল ময়ূর-কমানোর যুদ্ধ। চাকুরি ফেরতের দল কিলবিল করছিল। কিছুই ঠিক করে দিতে পারিলাম না। আমার মনের দরদর করত প্রবন্ধের কথা

ভবধূরের বিলাস বাজা

বলেছি" এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা দরকার মনে করি না। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, আরও যদি দু'এক মাস এই অংগলে বাস করি তবে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাব।

একবারে নিবান্দব সমীপবর্তী জীবনযাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ত ঘটত—কিন্তু অধিকাংশই মাতামহের কৃত্য ও অপকৃত্যের কাহিনী। এ ছাড়া বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। একদিন বল কি—আমি কে গ্রামে থাকতাম সে গ্রামের কাছেই একটা টিনের খনি ছিল। খনিতে অনেক চীন-দেশীয় মজুর কাজ করত। মজুরদের দল রাইন হ'তে বেশী দূরে বাস করত না। একদিন দুপুর বেলা যখন চীনা মজুররা বিশ্রাম করছিল তখন ক্রাম দেশের পুলিশ এসে মজুরদের সমুদায় হানা দেয়। ক্রামদেশের পুলিশ অশিক্ষিতও নয় এবং অসহিষ্ণুও নহে। তারা ধোঁবী মজুরদের ঘরার ভিত্তি যখন ওয়ারেন্ট বার-বরে; কুলিদের নাম এবং অন্যান্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিল তখন অনেকগুলি চীনা মজুরই অংগলের দিকে দীর-পদনিক্ষেপে চলতে যেতে থাকে। তা বেখে কতকগুলি পুলিশ পলাতকদের ধরতে যায়। তারা দীর পদনিক্ষেপে চলছিল তারা বেশ দৌড়োতে লাগল। পুলিশও তাদের পিছু নেয়। কিন্তু অংগল গভীর। একবার যদি কেউ গভীর অংগলে চুকতে পারে তাহ'লে তাঁকে খুঁজে বার করা ক্রমান্বয়ে কষ্টকর কাজ। পুলিশের দলকে পলাতক চীনারা কোনদিক দ্বিধা না করেই তবে হঠাৎ কোথা হতে মৃত বড় বিলাস লোক পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশ লাগের উপর গুলি দিলেও তারা একে বাস করল কি মরল না তার সম্বন্ধ কেউ কেহই জানে না। অংগলে দুই দোক চৈতন্য হারায়। লাগে-কাটা পোষাকের পাতাল ঘর। আর হাঙ্গামাধানে কিছুই থাকে না।

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

কি মরল তার খবর আমি নিতে পারিনি তবে যে সকল চীনা কুলি পালিয়েছিল তাদের কথা অনেকে ছ'এক দিন আলোচনা করছিল এবং তাতে আমিও যোগ দিয়েছিলাম।

চীনাদের সংগে শত্রুতা করা বড়ই কঠিন কাজ, বিশেষ করে চীনা কুলিদের সংগে। এদের বাড়িঘর নেই বললেই চলে। তাদের প্রাণের মায়া যে আছে কিনা তাও অনেক সময় সন্দেহ হয়। তাদের একটা বিশেষ গুণ আছে। সেই গুণটি হল যাকে তারা যা বলে তা অন্ধরে অন্ধরে পালন করে।

সিংগাপুর যাবার জন্ত আমি অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। এবার সিংগাপুর ফিরে যাবার সুযোগ পেলাম। পরের দিনই সকাল বেলা একজন খুনআইকে ডেকে এনে কোম্পানীর কাজ বন্ধিয়ে দিয়ে তাকে বেলার দিকে তংকা রওয়ানা হলো। তংকা পৌঁছতে আমি একটা লেগেছিল। তংকা বখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন রাত হবে। লোকজন প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। হোটেল রোডে প্রায়ই খোলা। বড় পথচারী-বাড়িগুলি আলো বন্ধ করে দিয়েছিল। মোটর হতে নামবার পর দুজন চীনা এসে বলল "কুলিচাই কেয়াগী" আমি তাদের আমার ট্রাক এবং বিছানাটা হোটেলের যেতে বললাম। হোটেলের মালিক দরজার কাছেই বসে ছিল। দরজার নম্বর বলে দিল এবং হোটেলের একটা বর আমার কুলি দুজনকে সঙ্গে গেল। বিছানা এবং ট্রাক রেখে দিয়ে কুলি দুজন কিংস রোডে গেল। কিন্তু অন্ধকারে মিলল না। হোটেলের বর বরের চাবিটা আমার কাছে রেখে যাওয়ার পর চাবিটা পকেটে ফেলে আমার পরিচিত এক বাবার দোকানের দিকে অগ্রসর হলাম। বাবার দোকানের দরজা খোলা। তখন অনেকগুলি জীলোকের সংগে কি একটা হিন্দু, কতকগুলি

ভবঘুরের বিলাস বাজা

আমাকে দেখা দাও সে হিসাব পরিত্যাগ করে আমার ভক্ত খাবার আনতে আদেশ দিল।

আমি দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম,—এসব কিসের হিসাব হচ্ছে বন্ধু ?

—দেশ থেকে এরা এসেছে, কারো কাছে কিছুই নাই, কে কত কর্ক মোব তারই একটা হিসাব হচ্ছে।

—স্বদের হারটা কত ?

—টাকা প্রতি মাসিক তিন আনা।

—এরা তা দিতে পারবে ত ?

—নিশ্চয়ই সক্ষম হবে বন্ধু। আমার তোমার পক্ষে টাকা রোজগার করতে বেশ কষ্ট হয় কিন্তু এই জ্বীলোকগুলি যখন দোকানে বসবে তখন ষোলক দশ ডলার থেকেউ আর করবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমি আর কথা বাড়ানাম না, কারণ যে সকল জ্বীলোক গভীর রাতে দোকানার বসে গল্প করে সময় কাটাতে পারে তারা কি ধরণের দোকানী দোকানী শক্ত। খাবার সমাপ্ত করে হোটেলের কিরে আমার

সময় আ—হং-এর সংগে সাক্ষাৎ হল। সেও আমারই নত মোটরে চাকা চলেছিল। আ—হং-এর পোশাক পরিবর্তন দেখে

আমি বুঝতে পারলাম তিনিই যখন ছদ্মবেশ নেয় তখন তারের পরিচয় পাওঁতে পারব হয়। এই খাবারের দোকানীকে আমি

আমি তার অল্প বিজ্ঞান গুলিরে দিলাম। আশুও তাই করলাম। একটা করে করে চক্রে চক্রে চক্রে আমারই সারসে

বসে বসে আমার মনের একটা পরিবর্তন হল না। সিংগাপুরে চলে

যাওয়া আমার কাছে কান্দু করে গিয়েছিল। বেদিন ভান মেঘের

ভবঘুরের বিলাস যাত্রা

ঘরে বসে যখন আমি পাক করছিলাম তখন একজন চীনা আমার পেছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং আমারই কাছে এসে বসে। অপরিচিত লোকটাকে দেখে যদিও আমার ভয় হল তবুও তাকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে বললাম “তোমার কি চাইছে?” লোকটি অতিশয় বিনয় প্রকাশ করে বলল, “আমার পরিচয় দিয়ে তোমার কোন দরকার নাই, তোমার কাছে সাহায্য পাবার জন্য এসেছি, যদি সাহায্য করো তবে আমার বিশেষ পরিচয় পাবে।”

“আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি বল?”

“গত তিন মাস ধরে মাইনে পাচ্ছি না, সিংগাপুরে চলে যাবার চেষ্টা করছি তারই ভাড়ার বোগাড় হচ্ছে না।”

“আর্থিক দিক থেকে আমার কাছ হতে কোন সাহায্য পাবার উপায় নাই। এর পরেও যদি সাহায্য করার কিছু থাকে তবে আমি আশ্রয় চেষ্টা করব।”

লোকটা আমার আরও কাছে এসে বসল এবং বলল, “তোমার কাছ হতে আর্থিক সাহায্য আমরা মোটেই চাই না। আমাদের যদি তোমার ফুলি বলে পরিচয় দিয়ে সিংগাপুর অথবা পেনাং পৌছাতে পারো তবে আমি তোমার দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াও পেমেন্ট উপরত্ব ডল্লারও মগদ দেব। কেমন তা হলেই ত তোমার হয়।”

আমি লোকটার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম “তোমরা চোর নও?”

লোকটা আরও বীরে বলল, “আমরা চোর নই আর ফুলি বলে তাতে তোমার কি আসে যায়, হুজুর! সাহাব, দ্বিতীয় শ্রেণীর পেমেন্ট পাবে আর যদি সিংগাপুরে গিয়ে থাক তবে আমরা তোমার দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াও পেমেন্ট দেব।”

ভবঘুরের বিলাত খাজা

করব।" আমি চীনা লোকটির কথায় রাজি হলাম এবং তাকে বলে দিলাম আগামী কালই আমি তুংকা বাব এবং লেখ্যামে পৌঁছে ফুলি চাই বলে তোমাদের আড্ডার গিরে আমি বিজ্ঞাপন দেব। তাতে আমি বলব, এখান থেকে যে সকল কুলি আমার সংগে ইপো বাবে তাদের বাবার ভাড়া আমি দেব না, ফিরে আসার ভাড়া দেওয়া হবে। এখন আবার টাকা দিয়ে বিদায় হও। লোকটি তার পকেট হতে ভিনশঙ্কু ভাম দেশের টিকেট আমার হাতে দিয়ে যে পথে এসেছিল সে পথেই বের হয়ে বাবার বেলা বলে গেল, তার নাম আ-হং।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠবার পূর্বেই অনেকগুলি সর্দার এসে হেঁটুলে ভিড় করল। নীচে নেমে এসে তাদের সংগে দরদস্তর করলাম। প্রত্যেক সর্দারকেই, কাজের দর সর্দারগণ অবস্থার বা পাওয়ার দায়, তার অর্ধেক বলতে লাগলাম। আমার কাজের দর শুনে কেউ কনট্রাক্ট নিতে রাজি হল না। আমিও এদের কাছ থেকে রেহাই পেয়ে আ-হং-এর দেওয়া লিট অফিসারী আটজন চীনা কুলির পারমিট জারি করার জন্য পালপোর্ট আপিলে গেলাম। আপিলের অনেকের সংগেই আমার পরিচয় ছিল। পারমিট পেতে কোন কষ্ট হল না। পারমিট নিয়ে ফিরে এসে আমি লজিং হাউসে বিজ্ঞাপন করতে লাগলাম। বখন আমি বিজ্ঞাপন করতাম তখন লুংপি ব্যাবহার করতাম। লুংপি পুস্তক বালি বয়স বনে থাকাই আমার অভ্যাস তবে সেদিন গারে একটি যেটি আমার কাছে কাঠের চীনা-ঘরঘের বড়ন ছিল। ঘরের বসন্তে কালো পুস্তকটি ছোঁয়ার এবং টান পাক্স ছিল। আমি ইতি কোথাকার বসন্ত পুস্তক করছিলাম।

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

বেলা তখন একটা হবে। বিঘ্নরেখার সূর্য্য-কিরণের উজ্জ্বল বেড়ে গিয়ে দক্ষিণ আকাশের এক কোণে মেঘমালা জমা হচ্ছিল। পাশের নারিকেল এবং সুপারী গাছগুলি গরমে কাহিল হয়ে উঠেছে। কলাগাছ গুলির পাতা এরই মধ্যে ঝরে পড়ছে। ইজি চেয়ারে বসে আমি তাই দেখছিলাম, এমন সময় একজন চীনা ভিক্টোরিয়া এসে ধললেন, এই ওঠ, সাহেব আসছেন। ইউরোপীয়ানদের এদেশে মালয় ভাষায় তোয়াণ বলে। আমি আর একটা ছুট শব্দ না ব্যবহার করে নিজের দেশের নদ্ কথাকাটা ব্যবহার করলাম। চীনাটা যখন বলল “সাহেব আসছেন, তুই এখান থেকে ওঠ” তখন আর ঠিক থাকতে পারলাম না। চীনাটাকে বললাম, তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আর। এরই মাঝে একজন যুবক অস্ট্রেলিয়ান আমায় সামনে এসে দাঁড়াল এবং হেসে জিজ্ঞাসা করল মিটার এখানে থাকবার সুবিধা হবে?

নিশ্চয়ই হবে, বহন এখানে। অস্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যান্ডার, ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান মালয় দেশে তাদের ছোট্টো সকেলের সংগে ভ্রম ব্যবহার করে না। তারা যখন কোন মোটরকারে করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যায় তখন কোনও ইঞ্জিন তারের আগে বেতে পারে না। পাশ কাটিয়ে তারা আগে চলে যায়। এতে যদি কোন ব্যতিক্রম হয় তবে মোটরকারে মোটরকারে থাকা অপেক্ষেতেও কষ্ট করে না। তার কলে যদি কোন ইঞ্জিনের অংশ চীনা করে তবে কেউ একটুও দৃষ্টি প্রকাশ করে না। ইউরোপীয়রা যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রকাশ করে এমন কি তাদের ভারতীয় সৈন্য চাকর করলে অনেক সময় কাঁধে কিছু যদি কোন ভারতীয় সৈন্য একটু উদ্ভয় দেখায় তবে তাদের ‘পিলয়ের কত টি’ বলে দৃষ্টি প্রকাশ করে না। কিন্তু এটা ভাষা বেশ।

ভবঘুরের বিশাল বাতাস

ধরনের ওস্তাদী চলে না। এখানে ইউরোপীয় বিচারক না। এখানকার জেলে সকলে সমান ব্যবহার পায়। ইউরোপীয় করেদীঘের অল্প বিশেষ কোনরূপ ব্যবস্থা হয় না। অষ্ট্রেলিয়ান দুবক তা জানত তাই তার মাথা ঠিক ছিল। কিন্তু ঐ চীন বাটা হল একের নব্বয় গোলাম, সে তার সহশ্রের লোকের কাছেই দাপট দেখাতে পারে, অপরের কাছে পোবা বৃকুরের মত হয়ে থাকে।

আমি চীনাটাকেই বললাম “যাও নীচ থেকে বয়কে ডেকে নিয়ে এস, একটা রুম দেখিয়ে দেবে।”

লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে নীচে গেল এবং চীনা শব্দে ডেকে এনে একটি রুম খুলিয়ে ওকে সংগে কবে প্রবেশ করল।

চীনাটা ঘরে ঢুকে অষ্ট্রেলিয়ান লোকটার কাছে সকল কথা নিশ্চয়ই বলেছিল। অষ্ট্রেলিয়ান তার কথা শুনে আমার প্রতি বেশ একটু কষ্ট হয়েছিল এবং যখন বেরিয়ে এসে ফের আমারই কাছে বসল তখন তার সিংগাপুরী মেজাজ ফিরে এসেছে। তাব ছিল সিংগাপুরী মেজাজ আর শ্রাবার ছিল স্বাধীন মেজাজ। উভয় মেজাজে বেশ জমে উঠেছিল। ওদের মেজাজ গরম হবার প্রধান কারণ হয়, যখনই এরা স্বাধীন ভ্রাম্য দেশে আসে তখন তাদের হাতে এক বেশী টাকা থাকে যে, তাঁকার সাহাব্যে অনেক সর্বর তারা অনেক কুকর্ম করতেও ছাড়েনা। এদেশী লোকেরা ওদের কুকর্মের টাকা দিয়ে সাহাব্য করে বটে কিন্তু টাকা পাবার পরই আবার কুকর্ম প্রাণ করে কুকর্মকারীকে বরিয়েও দেয়। আবার ব্যবসা বানিজ্য ছিল না। আমি ছিলাম একজন চাকুরে। তাও লোপ পেতে বসেছিল। অতীত আর্থিক দিক থেকে নবাপত অষ্ট্রেলিয়ানের দারা অতীত কোন নতি হবার সম্ভাবনা ছিল না।

ভবধুরের বিলাত বাজা

এরূপ লোক অনেক সময়ই খামখেয়ালী হয় এবং সমাজের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়। সমাজ সেই কতি নীরবে সহ্য করে নেয় এবং তথাকথিত ভগবানকে সমাজ-বান্দী লোকটার পাপের শাস্তি দেবার ভার দেয়। রাজপুরুষদের অত্যাচারও সমাজ সেরূপ ভাগেই অনেক সময় সহ্য করে। আমেরিকায় সেরূপ সমাজসংসকারীর সংখ্যা এক সময় বেড়ে যায়। তাদের দমনার্থে হঠাৎ দেখা গেল এক জেলীর তথাকথিত গুণ্ডার আবির্ভাব হয়েছে। তাদের কাজই ছিল অত্যাচারী রাজপুরুষদের, লোভীদের এবং সমাজবান্দীদের গুলি করে হত্যা করা। তার কল কিত্ত বেশ ভাল হয়েছিল। যে সকল সেনেটর কংগ্রেসে বসে নিজের মতলব সিদ্ধি করবার জন্য নূতন নূতন আইন তৈরী করছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অত্যা পেলেন এবং তাঁদের স্থলে নতুন ব্যাড়া এলেন অনেক সময়ই এসব ক্ষুধার হাতে প্রাণের ভয়ে নিবৃত্ত থাকতেন এবং অনেক সময় তাঁদের সমবাসনারীদের হত্যাকারীকে ষ্ট্রোরিট নাম দিয়ে সমাজে অপদ্রব্য করবার চেষ্টা করতেন। এই ধরনের জনসেবাকারী সংঘ এশিয়াতে সর্বপ্রথম জাপানে গড়ে উঠে এবং তারা ব্লেক-ড্যাগন নামে পরিচিত হয়। সেই অল্পকরণেই বাইল্যাণ্ডেও একটা দল গড়ে উঠেছিল, তাদের কাজই ছিল বাজা অভ্যাস ক'রে অর্থ অর্জন করে এবং সেই অর্থ সাহায্যে নানারূপ খারাপ কাজ করে, তাদের গুলি ক'রে হত্যা কর।

এই কারণেই ভাবদেপের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী অভিলোভের দিকে বেশী মন দিতেন না অথবা বেশী সম্মানের জন্যও দাবি করতেন পারতেন না, কারণ তাঁরা সকল সময়ই বিশেষ ভাবে অসুস্থ ছিলেন যে, তাঁদের জীবন পদ-পদেই কল বই খার কিছুর নয়। তাঁদের কাছে যে, ~~কোন~~ লোক যে কোন ভাবে দিবে কথা বলতে পারে। ~~স্বাভাবিক~~

ভবধুরের বিলাত যাত্রা

তাদের পক্ষে একজন সাধারণ লোকই ছিলাম, কিন্তু সাধারণ লোকের ক্ষমতাই আইন এবং ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়কে আমি জানিয়ে ছিলাম, কয়েক মাসের জল হয়ত জালয় দেশেই থাকব। এ কথার উত্তরেও ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন “আমাদের জীবন পদ্ম-পত্রের জল একধাটা নিশ্চয়ই জানেন; অতএব বিদায়ী নমস্কার।” ম্যাজিস্ট্রেটের “বিদায়ী নমস্কার” আমার কাছে বেশ লেগেছিল। বিদায়ী নমস্কারের সংগে আ-হংএর সংগে অনেক সম্বন্ধ ছিল। আ-হংও এক জন সমাজ সেবক। আ-হং শ্রেণীর লোকের সন্ধান এসিয়ার লোক তখনকার দিনে কমই জানত। তখনকার দিনে পৃথিবীর পাপীর দল এসিয়াবাসীকে নানারূপ শ্লোগানের ভেতরে ডুবিয়ে রেখেছিল।

একই স্বর্ষের নানা রকম রূপ। গ্রাম দেশের স্বর্ষ উজ্জল, প্রখর এবং আরামদায়ক। শরীর যদি স্বস্থ থাকে তবে সবই ভাল লাগে। এখানে আমার শরীর স্বস্থ এবং সবল ছিল। সেজন্যই আমার চোখে বা দেখেছিলাম তাই দেখতে ভাল লেগেছিল। তৎকালীন আমার কাছে তখন আরামপ্রদ বলে মনে হচ্ছিল এবং শহরটা পরিত্যাগ করবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। “কিন্তু কর্তব্য করে যেতে হবেই।” বেলা দশটার সময় জাহাজবাটে গেলাম। কুলিরাও জাহাজবাটে উপস্থিত ছিল, আমার কুলি রলে আটজন লোককে পরিচয় করে দিলাম। তারা মোটর বোটে উঠল তারপর আমি তাদের বাস বিছানা অস্ত্র মোটর বোটে উঠিয়ে দিয়ে তাতে চেপে বসলাম। বিদায়ের বেলা কাউন্স অফিসারদের নমস্কার করলাম, তারাও প্রতিনমস্কার করলেন। একটা দীপনিঃখাল হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল মনে হল যেন কিছু হারিয়েছি। যে দেশে এতদিন আমার কাটল তাকে বুঝি বা গোপনে ভালো খেলে-ছিলাম। ভালো খেলেছিলাম এই নির্জন নিঃশব্দ শান্ত জীবনের গভীর

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

প্রশান্তিকে, ভালো বেসেছিলাম এখানকার অর্থহীন জীবনযাত্রাকে ।
স্বাম দেশকে ভালো বেসেছিলাম ।

এবার যাত্রা আমার অকূলে—সঙ্গে আমার কয়েকটি অপরাধী,
আমি একলা । এদের সংগে আমার আত্মার যোগ নেই, এদের সংগে
আমার কতটুকুই বা পরিচয় । এরা কেমন মাতৃস তাত্ত্ব জানি না, শুধু
বিশ্বাস করি এদের নইলে এই প্রবল সমুদ্রের অধৈর্যে কয়েকজন
অজানা মানুষকে আমার ভাগ্যের বিধাতা করে পাড়ি দিতে তরঙ্গ
পেতাম না । একলা এদের আমি বিশ্বাস করি সন্দেহও করি । আ-হঃ
আমাকে তিন শত স্বাম দেশের টাকা দিয়েছিল । সত্য ছিল আমার
নিয়োজিত কুলি বলে পরিচয় দিয়ে তাকে এখং তার সংগের আরও
সাতজন লোককে পিনাং পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে । চীনা কুলি
কখনও কাউকে সেরূপ টাকা দেয় না, এরা স্বামদেশ হতে এমন কিছু
চুরি করে আনতে পারেনি বা বিক্রি করে প্রচুর টাকার মুক্তি
হতে পারে । যদি সেরূপ কিছু নিয়ে আসত তবে নিশ্চয়ই কাউকে
হাউসে ধরাও পড়ত ।

বাকগে—এরা এখন আমার কাছে কিছুই বলবে না । সিংগাপুর
পৌঁছে হরত কিছু বলতে পারে, সিংগাপুর গিয়ে হরত সকল কবাই
প্রকাশ করবে ! পিনাং অথবা সিংগাপুর পৌঁছান পর্যন্ত খেঁচ খেঁচ
ধাকাই ভাল । আমি যে এদের নিযুক্ত করেছি তাও বিশেষ করে
হাবডাবে প্রকাশ করা চাই । দ্বিতীয় জেবীর কেবিনে যেন বাস
করবে না । তাই নীচে গিয়ে কুলিরা কেবল ভাবে আছে ।

আমি নিজেও যে সকল ব্রিটিশ কাছাকাছি আমার সমস্ত জিনিসপত্র

ভবঘুরের বিলাত বাজা

জ্বর গঠন অল্প ধরণের হয়; কারণ এশিয়ায় লোক স্থখ কাকে বলে এখনও শেখেনি। আরব, হিন্দু, মালয় এবং বর্মীরা হিন্দুর কাছ থেকে একেবারে হিন্দুই হয়ে গেছে। এই চারটি জাতই সর্গে গিয়ে আমন্দ করতে চায়, আর এই পৃথিবীতে কুকুর বিড়ালের মত থাকতে চায়। চীনারা নিজেদের দেবতা বলে পরিচয় দেয় এবং নিজের দেশকে সর্গই বলে অতএব তাদের ক্ষেত্রে স্থখ-সুবিধা ভোগ করা এই পৃথিবীতেই। বর্মীও চীনা বাজী তৃতীয় শ্রেণীতেই বসেছিল তবুও তাদের কাছে ধাবারের কিছু না থাকায় তাদের বসবার স্থান পরিষ্কার ছিল। চীনারা খাষে কোম্পানীর দেওয়া খাত্ত। কোম্পানীর দেওয়া খাত্তে গরু এবং শূকর বাৎসরিক হ্রাস হয় সেজন্য হিন্দু এবং আরবগণ সেদিকে ঘেঁসে না। হয় তারা কটী এবং কল মূল খায়, নতুবা উপবাস কবে। আমার হিন্দু চলে গিয়েছিল বহু পূর্বেই। বাংগালী মুসলমান বিদেশে গিয়েও তাদের কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু বাংগালী হিন্দুর ছেলে বিদেশে স্থখেই দিন কাটায়। আমিও জাহাজে নানারূপ খানা খেতে লাগলাম। মাকে-মাকে বাইরে গিয়ে চীন। কুলীরা কি খাচ্ছে, কেমন আছে দেখে আসতে লাগলাম। আমার সমস্ত বেশ আমদানি কাটতে লাগল, মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমি যে কোন কঠিন কাজ হাসিমুখেই গ্রহণ করতে পারব। আমার মনে বেশ একটা গর্বের কারণ এসেছিল।

কতকটা দিন নকাল বেলা জাহাজ গিনাং কদরে নকর করল। কয়েকটাই বোতল হল না। সাম্পান-বোতল তীরে নামলাম। আ-হা-হা ইংগিতে তৎক্ষণাত্ কঠিন হাউনের বাইরে গিয়ে রিক্সায় বসলাম। নাতকম কুলি ডির ডির পথ ধরল তবু আমি আর মা-হা-হা একই মতিন হাউনে একই কদর দিয়ে উঠলাম। কদর গিয়েছিল।

পাঁচটি ডলার হাতে দিয়ে বলল, কেরানী আমার বাঁজটা এখন তোমাকে
কাছেই থাকল। কবের তাড়া সাত দিগ্ধের কাজ দিয়ে দেব। তুমি
এখানে সাত দিন থাকবে, তারপর আমার তোমাকে নিয়ে সিংগাপুর
যাব। যদি দরকার হয় তবে ইপো এবং টাইপিং-এ নামব।
তখন তোমাকে আমার কুলি খুঁজিতে হবে। এখন থেকে তোমাকে
আমি রীতিমত মাসিক বেতন দেব। বলত কত হ'লে তোমার খরচ
চলে যাবে।

কোনরূপ চিন্তা না করেই বললাম, বাট ডলাব-এর কমে হণে না।

আ-হং তাতেই রাজ হ'ল এবং চীনা প্রথাতে নমস্কার জানিয়ে
আমাকে ঘরের ভিতরে বেখে বা'র হতে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে
চলে গেল।

এ আমার পক্ষে বিড়ম্বনা, কর্মহীন অলস অবসর খুব বেশী ভালো
লাগে না। কাজের পাই অলস্ত করা চলে, শুধু আলস্তের অনবসর
মাতৃষকে কর্মের দিকেই আকর্ষণ করে। শরীর যদি সুস্থ থাকে তবে
কাজ করতেই হয়। ঘর বসে ভাবছিলাম এখন কি কাজ করব?
বই-পড়া আমার কাছে মোটেই ভাল লাগে না। মনকে বললাম, চল
একবার পিনাং-এর বাংগালীরা কেমন আছে তাই দেখে আসি।

সিলেটি মুসলমান পিনাং-এ অনেক ছিল তাদের সংগে আমার
পরিচয় ছিল না। আমার দেশের খানে এক জিলারও অনেক
মুসলমান ছিল তারা কোথায় থাকে তাও আমি জানতাম না। কাজ
আমাকে কিছু করতে হবেই, তাই ঠিক করলাম ঘোরাখালী খেলার
মুসলমানরা কে কোথায় থাকে তাদের খুঁজে বের করতে হবে।
সংগে পরিচয় করতে হবে, তারপর যদি পক্ষ হয় তবে তাদের সঙ্গে
সামান্যকালের বাব বন্দোবস্ত করতে হবে।

শব্দঘুরের বিলাত যাত্রা

। আমি যখন চিন্তা-ভাবনায় তন্ময় ছিলাম তখন কে এসে দরজায় আঙঠে আঘাত করল। “দরজা খুলে দিলাম। যিনি এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন তিনি হলেন একজন চীনা গোয়েন্দা। আমাকে পেয়েই তিনি নানাকপ প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। বুঝলাম বাদে আমি নিয়ে এসেছি তারা ভাল লোক নয়। ভাল হোক আর মন্দ হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না। গোপনীয় পুলিশকে জানিয়ে দিলাম, “অনেক দিন হল কোম্পানীর কাছে মাইনি পাইনি সেজ্ঞাত এখানে এসেছে এবং সত্বরই সিংগাপুর যাব। যে কয়টি চীনা আমার সংগে এসেছে তারাও কুলি। তাদেরও কাজ কর্ম নাই বলেই চলে এসেছে। ভিটেকটিভ আশ্চর্যিত হয়ে বললে, “কুলি এসেছে?” আমি বললাম, “হাঁ মহাশয় কুলিই, ঐ দেখুন না সর্দার কুলির বাস্‌টা আমার ঝমেই আছে। গোয়েন্দা আমার আদেশ না নিয়েই আ-ইংএর বাস্‌টা খুলে ফেলল। তাতে ছিল কুলীদের দেনা-পাওয়ার হিসাবের খাতা। চিয়াং-কাইসেকের কোটোবুস্ত চীনা ক্যালেন্ডার নাক্সাং খেলার কাক্সন এবং অন্ত্যাত্ত জিনিষ বা কুলিদের ব্যবহারেই লাগে। কাক্সটা দেখে-চীনা গোয়েন্দা বলল “দেখুন ত মশাই ডায় দেশের পুলিশের কাজ? কেবল করে জানিয়ে দিয়েছে আট জন ডাকাত আপনার সংগে এসেছে।”

আমি বিরক্তমুখে বললাম, “কিন্তু ঐ যে বাস্‌টা দেখছেন তাঁতে এমন কিছু নেই বা দেখে এদের ডাকাত বলে ধারণাও করা যায়।”

তিনি বললেন—“হঁ আমারও তাই মনে হয়, আসল লোক নিশ্চয়ই পায়ে ছোট পিনাং আসবে। ডাকাত কথাটা বড়ই বিজ্ঞ।”

আরও গোয়েন্দাকে বললাম—“ডাকাত কি মশাই, এরাও সবই কুলি এসেছে।”

ভবঘুরের বিলাস বাহ্য

আমার কথা শেষ হবার পূর্বেই একটা গীনা এসে বলল—“এই যে কেরানী আমাদের বাকসটা নিয়ে যাচ্ছি। আজই আমরা টাইনিং বাব, অন্ত কাজ পেয়ে গেছি। তোমার সংগে কথাই ছিল অন্তকাজ পেয়ে তোমাদের কাজ করণ না।”

আমিও বেগতিক ভাবে বললাম—“বা ভাল বোধ তাই কর।” ইংরাজীতে গোয়েন্দাকে বললাম “এরাই বোধ হয় কেবল বনিত ডাকাত।”

আমার কথা শুনে গোয়েন্দা বাদশাব শ্রাম দেশেব পুলিশকে গালা-গালি দিতে লাগল। লোকটা চলে গেলে গোয়েন্দা আমাকে বলল—, আমরা কি মাহুম চিনিনা, আমরা মুখ দেখলেই বলতে পারি কে ডাকাত আর কে ভালমাহুম।”

গোয়েন্দা চলে গেল। আ-হং এর বাকসটাও অন্ত একটা লোক নিয়ে গেল। ডাকাত আমার সংগে এসেছে তারাও উদ্বাও হল, এবার আমি একাকী। বাস্তবিকই কিসের একটা অতাব অতুতব করতে লাগলাম। ভাল করে স্নান করে, উদ্রম একটি স্রুট পরে লজিং হাউস হতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম গেলাম একটি খানারের দোকানে। বেশ করে খেয়ে তারপর গেলাম পিনাং এর ঠাকুর বাড়িতে। এখানে একজন ঝাংগালী পূজারী কাজ করতেন। তার সংগে সাক্ষাৎ হল। বেলা একটা পর্যন্ত ঠাকুরের সংগে গল্প করেই কাটলাম তারপর লজিং হাউসে এসে শুয়ে পড়লাম।

স্মৃতিদিন যে কোন প্রকার আমাকে এখানে থাকতে হবে এবং আ-হং-এর সংগে দেখা করতে হবেই। আমার টাকা-পয়সারও অভাব নাই, অতএব এই শান্তটা দিন কতকগুলি সহ্যদিলজ কিসে তাই পারি করার চিন্তা করলাম এবং বিকালের দিকে একটা পুরানো মুক্তক

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

দোকানে গিয়ে পুরাতন কতকগুলি পিনাং গেজেট, ষ্টেট টাইমস্, মালয় ট্রিবিউন এবং অন্যান্য দু-একখানা লণ্ডনের সংবাদপত্র কিনে তাই পড়তে লাগলাম। মনে আছে—তার ভেতর ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসের লণ্ডন টাইমস-এ একটি বিশেষ প্রবন্ধ বের হয়েছিল তাতে লেখা ছিল—“যদি চীনা কমিউনিষ্টদের নিপাত না করা হয় তবে চীনা শ্রাস্তাণাল গভর্ণমেন্টও অকালে অন্ধা পাবে। স্বধের বিষয় চীনাং কাইসেকই তার ব্যবস্থা করছেন।” এমনি ভাবে প্রবন্ধটি শেষ করা হয়েছিল, যাতে করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম চীনা কমিউনিষ্টদের ওরা ডাকাত বলেই মনে করে। এদের কাজ-কর্মের কথা যত না বলা হয় ততই ভাল ইত্যাদি। মালয় দেশের সংবাদপত্রগুলিও সেইজন্ত চীনা কমিউনিষ্টদের ডাকাতই বলত। অনেককণ কাগজ পাঠ করে রোপ ইয়ক নামক একটি পথ দেখার ইচ্ছা হল। উদ্ভেদ আর কিছুই ছিল না, যদি আ-হং-এর সংগে দেখা হয় তবে তার সংগে কথা বলে আরাম পাব।

রোপ-ইয়ক কদরস্থান। এখানে রাতে ভ্রলোক চলাফেরা করে না। আমি একজন ভ্রলোক সে ধারণা আমার সকল সময়ই ছিল। তবুও আজ এই মল্ল পথে পায়চারী করতে বের হতে হবে, তা কি ভাল হবে? মর্কের মাঝে তাই নিয়ে একটা গুণগোল বাধল। জুবধেবে রোপ-ইয়ক বাওয়ারই স্থির করলাম এবং বিছানা হ’তে উঠে বসলাম। ছলিরা ষ্ট্রিট হ’তে রোপ ইয়ক কাছেই। পোয়াক পথে পথে বের হলাম। রোপ ইয়ক ষ্ট্রিটে গিয়ে একটা চারেক মোকামে বসলাম। পবচারী সকলেই চীনা, মোকানীও চীনা, তবু আমিই একমাত্র বিদেশী। চীনা মোকামে বসে, চারের মোকামের লাজ-সজ্জা দেখতে লাগলাম। বিজলি বাড়ি এক প্রথর ছিল যে মোকাম বলাই বাজির্দ। চীনা এক

ভবস্থরের বিলাত বাহা

জাপানীরা অতি উজ্জল বিজলী বাতি ভালপাসে। আমেরিকামরাও সেরূপই। ইংরেজ অঙ্ককার-প্রিয় এবং নীরবে থাকাকাটা যেন তাদের মজাগত অভ্যাস। আমরা ইংরেজের প্রজা। ইংরেজদের আর কোন গুণ আমরা না পেলেও তাদের সেই নীরবতা এবং অল্প-আলো প্রিয়তা আমরা অভ্যাস করেছি। আমিষ্ট তা হ'লে এম পাড়িনি। ভবিষ্যতে আরও কত গুণ আরও করব তার অবধি নাই। নীরবে এবং অতি আলোর মধ্যেই চায়ের দোকানে সময় কাটাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম আ-হং-এর দেখা পাব কিন্ত তার টিকিটিও দেখতে পেলাম না। অনেক-কাল বসলাম তারপর পথে এসে আরও জনাকীর্ণ পথের দিকে রওয়ানা হলাম। আ-হং-এর দেখা তবুও পেলাম না। আ-হং কোথায়? তাকে না হলে যেন আমার চলছিল না। রাত্র তিনটা পর্যন্ত পথে পথে বেড়ালাম, তবুও তার সংগে দেখা হল না।

আ-হং-এর সংগে একটি মাত্র বিষয়ে আমার সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কটি হল বিদায়ের বেলা বলে গেছে সে আমাকে বাট ডলার করে মাসিক মাইনে দেবে। তার সংগে যদি আমার আর দেখা না হয় তবে সকল কথাই শেষ মাসিক বাট ডলার আর পাওয়া যাবে না। তখনকার দিনে টাকা অর্জনই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। তখন তত্ত্ব-মন্ত্রে বিশ্বাস ছিল। মনে হল, মন্ত্রের সাহায্যে লোক গর্ত হতে লাগকেও উঠিয়ে আলে, আ-হং বাহুব, তাকে মন্ত্র-বলে কাছে নিয়ে আসতে পারবনা সে কেমন কথা? তাই মন্ত্রে রক্ষিত একটি মন্ত্রের বই খুলে একদিন গভীর রাতে মন্ত্র আওড়াতে লাগলাম। ভাবছিলাম তৎক্ষণাত্ মন্ত্রজ্ঞান এবে আ-হং থাকে বেবে, কিন্তু তা হল না। আ-হং-এর দেখা পাওয়া কোল না।

দুটা দিন সংবাদপত্র পাঠ করে এবং সিনেমা দেখে কাটিয়ে বিলাতী কতীর দিনও কাটল। চতুর্থ দিন সকাল বেলায় সেই মন্ত্র জামার

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

দরজায় মুহূর্তেই করাঘাত করল। ভাবলাম আ-হং এসেছে। দরজা খুলে দেবামাত্র একটি চীনা আমার সংগে ভাংগা মালয় ভাষায় এমনি ভাবে কথা বলতে লাগল যা শুনে কেউ ভাববে না সে কুলির কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ জানে। আ-হং-এর লোক বলে সে আমার কাছে তার পরিচয় দিল। তাকে আশু জিজ্ঞাসা কবলাম কবে এখান থেকে রওয়ানা হতে হবে, আমার কাছে থাকারের আদ টাকা নাই। লোকটা তৎক্ষণাৎ দশ ডলারের একখানা নোট বের কবে দিয়ে বলল, আরও কয় দিন থাকতে হবে। বেশ কবে খাও আর মজা কর। পিনাং হিলাটা গিয়ে দেখে এস বেশ সুন্দর, সময় বেশ কাটবে। ছাপি ভ্যালিতে বেরো-বুঝলে কেরাগী, এখন আমি চললাম।”

তারপরই কাজের কথা আরম্ভ হল। বেশ উচু করে বললাম, “আমি সম্বরই টাইপিং এবং ইপো যাব, সেখানে যাবার পূর্ব যদি আমার কাজ হয় তবে তোমাদেরও কাজ হবে। কাজ কাজ কবে আমার কেপিও না; সিংগাপুরেও চিঠি লেখেছি, দেখা যাক কি হয়। তোমাদের ঐখ্য ধরে থাকতেই হবে, এখন যাও।”

চীনা লোকটাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলাম না। তবে আ-হং কে এবং কেনই বা সে এমন ভিগ্বাক্সী খাচ্ছে সে রহস্যটা তেদ করার জন্য মনটা একটু উদ্গ্রীব হল।

শেদিন বিকালে ছাপি ভ্যালি দেখতে গেলাম। সুন্দর যে স্থান। নানা দেশের নর্তকীরা নাচছে, গাইছে, আমোদ করছে। নানা রকমের লোক। কেউ কেউ জুয়াখেলার দোকান বসেছে। অনেক বকাসব্ব, হারিয়ে মাথায় হাত দিয়ে কান্না খাচ্ছে, আরও কেউনা অনেক টাকা পেয়ে নানারূপ আমোদে মগ্ন হয়েছেন। ছাপি ভ্যালিতে নানান রকমের লোক এসে থাকা করেছে। এক আমদান, এক

শ্রমিকের বিলাত যাত্রা

সৌন্দর্য কিত্ত আমি যেন কোথাও শান্তির সন্ধান পেলাম না। সবই যেন আমার চোখে ছারাবাজীর দৃষ্ট আসছিল আর চলে যাচ্ছিল। পিণ্ডাং হিলেও ঠিক সেইরূপ হয়েছিল। মাংস ক'ছে কালো, সাদা, নীল, গাঢ় নীল, সবুজ রংগের মেঘগুলি দোড়ে এসে আমাদের ভেদ করে তারা চলে যেতে লাগল। আকাশ কখনও মেঘ ঢেকে ফেলাছিল আবার কখন বা মেঘ সরে যাওয়ায় সূর্যের তেজস্বী হরিৎ পর্বতমালায় উপর ছুটে আসছিল। নারব চীনা মন্দিরের চীনা পূজারী নীরবেই এক ঘর থেকে অল্প ঘরে যাওয়া-আসা করছিল। তাদের খাবার ঘরে সামান্য ভাত আর সবুজ শিদ্ধ দেখে মনে হচ্ছিল এরা এই খেয়ে কি করে বাঁচে। তাদের চোখেও ক্ষোভটি আমার হৃদয়ে যেন ধারালো সূচের মত এসে প্রবেশ করে ফের বিপরীত দিকে বের হয়ে যাচ্ছিল। এটা ময় শক্তি নয় এটা অনেক দিন কষ্ট সাধনের ফল। আমার কাছে পর্বতের নীরবতা মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি মানুষ। আমি মানুষের সংগে থাকতে চাই। বাই হোক—পঞ্চাশ সেন্ট দাঁড় দিয়ে ফেব্রুয়ারি গাড়ীতে বসে ফিরে এসে ট্রাম ধরলাম। ট্রাম নারিকেল ও সুপারী-বাগানের তেতর দিয়ে শহরে আসছে। শহর দেখেই সুখী হলাম। মনের পরিবর্তন হল। আবার আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল।

নবম দিনে সকাল বেলা পিণ্ডাং হতে রওনা হবার আবেশ পেলাম এবং পঞ্চ-বরচা বারদ আরও কুড়ি ডলার একজন লোক আমার কাছে দিয়ে গেল। আ-হঃ নিজে কিত্ত পিণ্ডাংএও আমার সংগে আর কেউ করল না। তার কথা-মতই আমি টাইগি, হামক, হামক, হামক করলাম। কেউ এসে কেউ করল না, কোথাও কোথাও

ভবঘুরের বিলাত বাজা

তাও বলে দিল না। আমিও কারও আদেশের অপেক্ষা না করে সিংগাপুরের গাড়ীতে গিয়ে বসলাম এবং পরের দিন সকালবেল সিংগাপুরের টেক্স রোড নামক ঠোনে গিয়ে নামলাম। কাঁছেই লংকা হোটেল নামে আমার পরিচিত একটি হোটেল ছিল, তাতেই গিয়ে উঠলাম। হোটেলের মালিক কয়েক দিন আমাকে বেশ করে খাওয়ালে, এতেও আমার মানসিক অবস্থার উন্নতি হ'ল না।

বোধ হয় দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। এরই মধ্যে আমি আমাব কোম্পানীর বিরুদ্ধে পাওনা বাকি বেতনের জ্ঞা লেবার অফিসে নালিশ করে এসেছিলাম। পাঁচ শত ডলার পাব বলে সামান্য ইংগিত লেবার-প্রটেক্সন-অফিসাব আমাকে দিয়েছিলেন। এরই মাঝে এক দিন আ-হংএর সন্ধে সাক্ষাৎ হল। আ-হং আমার কাজের জ্ঞা আমাকে ধন্যবাদ দিল এবং যদি ইচ্ছা কবি তবে তাদের সংগে থাকতে এবং খেতে বলল। আমি সংগে থাকতে এবং খেতে রাজি হলাম না, তবে তাদের সংস্পর্শে থাকতে রাজি হলাম।

কে আ-হং ?

একটি লম্বা চিম্ড়ে শুকনো প্রাপবয়স্ক ভদ্রলোক হলেন 'আ-হং'। তিনি একজন নাম-করা শিক্ষিত লোক। তাঁর কাজই ছিল বেশ বিদেশে চীনাঘের মাঝে প্রগতিশীল চিন্তাধারা-বিস্তার করে। আমরা যেমন নিজীব, চীনারাও ছিল ঠিক শেরশই। শুধু আ-হংএর নেতৃত্ব তারা ভাঙা দ্বন্দ্ব না, আমাদেরই মতই ঘুরে ঘুরে নামকরণ হ'ল। আ-হংও আকর্ষণ ছিল। তবে চীনাঘের সংগে

উষস্বরের বিলাস যাত্রা

একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। চীনাদের মাকে জাতিভেদ ছিল না এবং এখনও নাই। সেই মাদার্লিক রোগ চীনাদের মাকে না থাকার জন্যই তাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবন তাড়াতাড়ি চলিল। চীন সরকারের আদেশে নয়, শুধু চীনা যুবকদের উপদেশেই জালস এবং ক্রামদেশে যত চীনা ছিল তারা, বারবণিতা-প্রথা একমাসের মধ্যে উঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়। মালয় দেশের ব্রিটিশ সরকার এবং ক্রাম দেশের গণতান্ত্রিক সরকার ভেবেছিলেন বারবণিতা প্রথা লোপ হ'লে চীমারা উচ্ছৃংখল হবে, অপরের গৃহে প্রবেশ করে অন্তায় কাজ করবে, কিন্তু এসব ঘটল না। চীমারা আরও সাবধান হয়ে দিন কাটতে লাগল। এতে মালয় এবং ক্রাম সরকারের আর কয়েক ব্যয়। এ কাবণেই বোধহয় মালয় এবং ক্রামদেশ হতে প্রগতিশীল চীনাদের তাড়াবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। আ-হং অশিক্ষিত চীনাদের মাকে গোপনে শিক্ষা প্রচার করতেন। এক দেশ হতে অন্য দেশে নাম বদলিয়ে ভ্রমণ করতেন। আ-হং ক্রাম দেশেও চীনাদের তেতর বাতে সস্তর মেন্ডেরিণ ভাষা প্রচলন হয়, এবং তারা তাড়াতাড়ি আক্ষিপ ছাড়তে পারে তারই জন্ত চেষ্টা করছিলেন। বর বণিতাবুদ্ধি উঠে বাওয়ায় ক্রাম-সরকারের সমুহ ক্ষতি হয়। এখন যদি আক্ষিপ-এর প্রচলনও বন্ধ হয়ে যায় তবে বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল, সেইজন্য আ-হং প্রেণীর লোককে ধরে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছিল।

একদিন দুপুর বেলা আমি আ-হংএর বাসস্থানে ছিলাম। আ-হং আমাকে তাঁর ট্রিকানা দিয়েছিলেন বলেই তাঁর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনি যে ট্রিকানার আমাকে বেতে দিয়েছিলেন সেই ট্রিকানা মতে বন্ধুত্বপূর্ণ পৌঁছে প্রেণি এটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ

শবঘুরের বিলাত বাত্মা

চীনা এখানে বাস করে। স্থানটাও সুবিধা নয়। চুরি ডাকাতি এদিকে প্রায়ই হয়ে থাকে। তারপরে যে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালাম সেটাকে দেখেই মনে হ'ল যে, বুঝি এখনই বাড়ীটার দিকে পড়ল। এরকম বাড়িতে প্রবেশ করতেও আমার ইচ্ছা হ'চ্ছিল না। অতি কষ্টে দোতালার উঠে সামনের ঘরের দোরে টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। হাসিমুখে আ-হং বেরিয়ে এসে আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসালেন। ঘরের ভেতরটা বেশ পরিষ্কার ছিল। থু-থু ফেলা নিষেধ বলে দেওয়ালে নোটিশ লেখা ছিল। সিগারেট খেতে হলে অতি সাবধানে খেতে হবে এবং সিগারেটের ছাই যেন মেঝেতে না পড়ে সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে একথাও বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল। আমি সিগারেটও খেতাম না, থু-থু-ও মাটিতে ফেলতাম না, অন্ততঃ আমার পক্ষে তাঁর ঘরে বসটা মোটেই কষ্টকর ছিল না।

আ-হং সেদিন তাঁব অতীত জীবনের ঘটনাবলী বললেন এবং তারপর চীনা জাতের কি করে উন্নতি করবেন তারই একটা পরিকল্পনা আমার সামনে ধরলেন। আমি তাঁর সে পরিকল্পনা দেখে ভাবতে লাগলাম চীনারা নিজের জাতের অন্তঃনিহিত স্বার্থ কত সহজে বিসর্জন দিচ্ছে! আ-হং একজন বিবাহিত লোক। তিনি কিয়ংসি প্রদেশের বাসিন্দা। অতি কষ্ট করে যে টাকাগুলি বোবনে অর্জন করেছিলেন তাই পণ দিয়ে তাঁর স্ত্রী সাই-চান্দকে বিয়ে করেছিলেন। সাই-চান্দ বিবাহের পর তাঁর ঘরকরা স্বচাক্রুপেই চালিয়ে যেত। তবে তার একটা দোষ ছিল। সে মাঝার বেশী চুল রাখা পছন্দ করত না। ১৯২৬ সালে চীন দেশে নতুন করে আর একটা বিদ্রোহ হ'ল, সেই বিদ্রোহের সময় সাই-চান্দ স্বযোগ পেয়ে মাঝার চুল কেটে কেবল এক "কাট" করে চুলগুলি শুষ্কিয়ে রাখল। ১৯২৮ সালে

তব্বুয়ের বিলাত বাজা

জেনারেল চিয়াং কাই-সেকের আদেশে দেশে যত "বব্ কাট"এর চুল ছাঁচা মেয়ে লোক পাওয়া গেল তাদের হত্যা করা হয়। সাই-চানকেও অবশ্য হত্যাই করা হয়েছিল। সাই-চানের একটি মেয়ে এখন কোথায় আছে আ হং তা জানেন না, কারণ সাই-চানকে হত্যা করার পর স্থানীয় পুলিশ তাকেও হত্যা করার আদেশ দেয়। আ-হং তাঁর আসল নাম পরিবর্তন করে নকল নাম সা-হং নিয়ে বিদেশে রওয়ানা হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, বতদিন বেঁচে থাকবেন চীনাঙ্গের মাঝে তিনি ক্রমাগত বিদ্রোহভাব প্রচার করবেন এবং স্বঘোষণা পোলে বিদ্রোহও করবেন। প্রচার কাজের জন্তই তিনি শ্রাম দেশে গিয়েছিলেন কিন্তু স্থানীয় চীনা নেসনেলিষ্ট মল তাঁর আগমন টেব পায় এবং তাঁকে ধরিয়ে দিয়ে বেশ কিছু মোটা টাকা পুরস্কার পাবার চেষ্টা করে। তিনি কালবিলম্ব না করে ব্যাংকক হাঁতে পালিয়ে পিগাং-এব দিকে রওয়ানা হন কিন্তু ভুল করে তংকায় এসে জাজির হন। এখানে তিনি তাঁর এক সমবায়সায়ীর দেখা পান এবং আর্থিক-~~কাজ~~ ~~পোরে~~ পিগাং বাবার চেষ্টা করেন।

আ-হং স্ত্রী পুত্র হারিয়েছেন। স্ত্রী-পুত্র হারাবার পরও দেশের কাজে মন দেওয়া বিদেশীর শোভা পায়। আমি আ-হংএর কথা শুনে নিজের দিকে চেয়ে একটু লজ্জিত হলাম। প্রকৃত পক্ষে আমি দেশ সেবার কাজে কিছুই করছিলাম না। আমি অবিবাহিত। সংসারের বন্ধন নাই বললেও চলে। তবুও সংসারের চিন্তাই আমাকে কখনো সময়ই কাবু করে রাখত। আমি আহং-এর মতো বলেই না থেকে বাড়ির কথা সব ভুলে গেলে দিলাম। এখন কথা হল আমি দেশ-সেবা করতে গিয়ে কি করব তাই ভাবছিলাম। এ

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

উপদেশ চাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, “এ সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা না করাই ভাল কারণ আপনাদের দেশের অবস্থা আমি কিছুই জানি না।”

আ-হং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিংগাপুরে অনেক দেশবাসীর সংগে মিশতে লাগলাম। যতগুলি লোকের সংগে দেখা হ’ল তাদের মাঝে এমন একজনও লোক পেলাম না যারা দেশের কথা একটুও ভাবে। সকলেই স্ব-স্ব চাকরী বজায় রাখতে এবং যেন-তেন প্রকারে প্রমোশন পেতে, ও মাসের শেষে বাড়িতে কি করে টাকা পাঠাতে হবে তাই ভাবতেই আর সময় পায় না। আপনার গ্রহপথে তারা ঘুরপাক খায়, দেশ কি, দেশের কাজ কেন করা দরকার—এসব তাদের কাছে অবাস্তব কথা। ফের আমি আ-হং-এরই শরণাপন্ন হলাম। তিনি দয়া করে কয়েকখানা বইএর নাম আমাকে বলেছিলেন, যা তখনকার দিনে সিংগাপুরে পাওয়া যেত না। এমন কি স্বদেশে যে সেই বইগুলি আমদানী করা হ’ত তাও আমার মনে হল না। কয়েক দিনের মধ্যেই কতকগুলি শিক্ষিত বাঙালী কলির সংগে সাক্ষাৎ হয়। তাদের কাছ থেকেই আমি সবপ্রথম আমার দরকারী বইগুলি পাই এবং তাই তত্ত্বয় হয়ে পড়তে থাকি। আমার এখানকার দিনগুলি বেশ কঠোর কটছিল। অর্থান্ধারও ছিল না এবং উপদেশ পাবারও লোকের অভাব হ’ত না।

মজুরী না পাবার জন্য কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করেছিলাম। মোকদ্দমার সাড়ে তিন শত ডলার ডিগ্রি হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই টাকা পেয়ে বাই। অনেকগুলি টাকা একত্রে পেয়েছি। সেই একজন বাঙালী আমার উপর ক্রমাগত দৃষ্টি রাখতেন। নতুন ব্যক্তি আমায় দেখে থাকত। ভাব-প্রবণতা

তবধূরের বিলাত যাত্রা

করত। হাতের টাকা ট্রাংকেই পড়ে রইল। চোরের দৃষ্টি সেদিকে
 আকৃষ্ট হল। চোর ছিল শিকড়ি। বই পড়ার সময় তাকে কাছে
 রাখতাম এবং বড় অভিধান খুঁজে শব্দার্থ বের করে ওনাতে বলতাম।
 সে অতি চতুর, আমার কথা তৎক্ষণাৎ পালন করত। হাসখানেক
 বাবার পর লোকটি কোথায় চলে গেল। আমি আমার টাকার কথা
 যেমন ভুলে গিয়েছিলাম তেমনি ভুলে গিয়েছিলাম সেই লোকটির কথা।
 একদিন সকাল বেলা হোটেলের ম্যানেজার এসে বিল দেয়। আমি তার
 বিল মিটিয়ে দেবার জন্য বাস্তব খুলে দেখি তাতে একটি শুলারও নাই।
 তৎক্ষণাৎ বুঝতে পাবলাম টাকা কোথায় গেছে। হোটেল-ম্যানেজারকে
 জ্ঞানলাম বিকালে টাকা পাবে এবং বিকাল বেলা তার প্রাপ্য মিটিয়ে
 দিই। টাকাটা দিয়েছিলেন আমার একজন বন্ধু। বন্ধুকে তখন আমার
 টাকা চুরির কথা বললাম তখন তিনি আমাকে বেশ এক চোট
 নিয়েছিলেন এবং বলছিলেন আব হোটেল থেকে না এখানে চলে এস,
 বাবার থাকবার এবং হাত খরচের অভাব হবে না। কিন্তু আমি সে
 দিনই চলে আসিনি, তখনও দুখানা বই পড়ার বাকী ছিল। মন দিয়ে
 তাই অধ্যয়ন করতে লাগলাম। হোটেলের ম্যানেজার কি করে
 বুঝতে পেরেছিল আমার হাতে একটি পয়সাও নাই এবং সেজন্যই সে
 প্রত্যেক দিন রাত নটার সময় বিল উপস্থিত করতে লাগল এবং যাতে
 আমি তার পাওনা প্রত্যহ দিয়ে দিই সেজন্য নানা কথা বলতে লাগল।
 প্রথম দিন যিনি আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁর কাছে
 কয়েক দিন পর ফের টাকার অন্ত যেতে হল। সেই তত্ত্বলোক তদানক
 রাণী। তিনি বললেন “এখন হোটেল থেকে থাকবে, নিজের মান-
 ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারে পার না? আজ্ঞা, এখনই তোমার হোটেল থেকে বাব
 এবং তোমার বইয়ের বাকী দিচ্ছি।”

উবঘুরের বিলাত বাজা

বিজ্ঞান করেই বের হবেন কিন্তু তা না করে হঠাৎ তাঁর মনে কি হল
অমনি তিনি আমাকে নিয়ে হোটেলের দিকে রওয়ানা হলেন।
পথে আমাদের মধ্যে কোন কথাই হল না। হোটেলের উপস্থিত হয়ে
হোটেলের মালিককে ডেকে আমার টাকা এবং খাবারের তিন মাসের
খরচ এক স্লুগে দিয়ে বললেন, আর যেন আমার বন্ধুকে তোমার
ম্যানেজার কোনরূপ কষ্ট না দেয়। বন্ধু আমাকে হোটেলের রেখেই
চলে গেলেন। আমি হোটেলের বসে বন্ধুর টাকা দেবার বাহাচরীর
কথা না ভেবে ভাবতে লাগলাম লোক কেন চুরি করে। মানুষকে
মানুষ যখন অস্তিত্ব করে তোলে তখনই মানুষ কুপথ অবলম্বন করতে
বাধ্য হয়। যে লোকটা আমার টাকা চুরি করেছিল সেও নিশ্চয়ই
আমার মত কোন বিপদে পড়েছিল। আমাকে বিপদ হতে উদ্ধার
করার লোক মিলেছে, তার বিপদে সাহায্য করার কেউ ছিলনা বলেই
সে এই কুকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে।

ছদ্মশ্রুতিতে গেল। হঠাৎ স্ক্রালয় টিবিউনে দেখলাম আমার
বিপদের বন্ধু চাকরি ছেড়ে দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বের হবেন বলে ঠিক
করেছেন। তাঁকে এই কাজে বাধ্য দিতে আমার সাহস
হল না। তবে তাঁকে মৌখিক সাহায্যও করলাম না। তিনি চলে
বাবার পর আমাকে সাহায্য করার মত লোক সিংগাপুরে
ছিল না। প্রথম কয়েক মাস কম খেতে লাগলাম। তারপর
উপবাস, অর্ধ উপবাসের পর মিরমু উপবাস করে দিন কাটতে
লাগলাম। শরীর ওতে শুকিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন মনে হল
ঐ! যে আমার বন্ধু তিনিও একদিন পদস্থ লোক ছিলেন, হয়ত তিনি
ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে খাবার এবং শাকবাব কন্দোবক করতেন
আমিই বা কেন বনে দাঁড়ব। আমিও মিরমু উপবাস

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

করব। বিদেশে যাবার পথ আমার মত লোকের পক্ষে খোলাই ছিল।

সিংগাপুরে বয়, বাবুচি, থালাসী আশুন-ওয়ালা এসব কাজে কোন বাঙালী হিন্দুকে নেওয়া হত না। বাঙালী মুসলমানের জন্ত কিন্তু এসব কাজ খোলা ছিল। এই নিয়মটি প্রকৃতভাবে আইনে পরিণত হয় নি, তবে মৌখিক ভাবে এই নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে পরিণত হ'ত। কোন বাঙালী হিন্দুকে নাবিক হতে দেওয়া হ'ত না। বাঙালী হিন্দুর কাছে বিশেষ করে বিদেশে ধর্মটা কিছুই নয়। সেজন্ত দরকার অল্পযারী যে কোন বাঙালী, উড়িয়া এবং বেহারী তাদের নাম পরিবর্তন করে নাবিক হতেও সক্ষম হত। সারেং সাহেবরা ভাবতেন একবার মুসলমান হলে কি আর হিন্দু ধর্মে কিরে যেতে পারবে? নিশ্চয়ই না। সময়ের পরিবর্তনের কথা তাঁরা মনে নিতে রাজি হবেন না।

আমি একদিন একজন সারেং-এর কাছে গিয়ে স্ব-ইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম কবুল করে আসলাম। আমার নতুন নাম হল হুসরত আলি। কথা হল সারেং আমাকে একটি বয়ের কাজ ঘোঁসাড করে দেবেন এবং ইসলাম ধর্ম কবুল করার জন্ত পঞ্চাশ টাকা নগদ দেবেন। আমি নগদ টাকাটা পেয়ে বেশ করে কয়েক দিন খানা-পিনা করলাম এবং ইতিমধ্যে যখন চাকরীর ঠিক হবে বলে শুনলাম তখন আমি মনের আনন্দে আলিতে গলিতে বেড়াতে লাগলাম। শরীরের শক্তি কিরে এল। কাজ করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। আমি বাব সাগরে, সাগরের ওটা-নাচার সংগে আমার শরীরও নাচবে। আমি তাতে আনন্দ পাব।

কাজ কানাই? তাতে ছোট বড় কিছুই নাই। একখাটা মনে রেখে রাখি, কাজে অগ্রসর হওয়া বার তবুে কিছুতেই বাধে না।

ভবঘুরের বিলাত ব্যাড়া

আমরা সেকথা অনেক সময় ভুলে বাই। আমাদের সমাজ নিশা এবং গল্পনা করে লোককে অসংপথে পৌছে দিতে সক্ষম হয় কিন্তু কাজ দিতে পারে না। আমাদের 'ধর্ম'ও অন্ধ বিশ্বাস ক্রমেই চলে যাচ্ছে। সেজন্য আমাদের যে কোন কাজে অগ্রসর হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। হিন্দুদের মাঝে আজ এমন একটি লোক পাওয়া যাবে না যিনি ধর্মাস্তরকারীকে পঞ্চাশ টাকা নগদ দিতে পারেন। টাকা পয়সার দিকে অস্থিতি দেখিয়ে দিয়ে পরনিন্দা করার লোক হিন্দু সমাজে অভাব নাই। কিন্তু কতদিন লোক পরনিন্দাকে ভয় করবে? যারা পরনিন্দুক তারাই মুখ লুকিয়ে থাকবে। যারা কেরাগীর কাজ করে বেশ ভাল আছে বলে মনে করে, তাদের অবস্থা যদি ভেবে দেখা যায় তবে দেখতে পাওয়া যাবে তারাও আশঙ্কিত হয়েই জীবন কাটায়। আমাদের সমাজের অবস্থা ভয়ানক দুর্বল। এ ক্ষেত্রে সমাজের উপর নির্ভর করব, সমাজের কটাক্ষ আড়চোখে দেখা কোনমতেই সংগত হবে না' ভেবেই আমি আনন্দের সহিত বয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলাম।

মুসলমানী মতে আমার নাম বদলানো হয়ে গেছে। মুসলমানী বজার রাখতে গিয়ে লুংগি এবং মালয় টুপি পর্বত ব্যবহার করত হত। সিপিং অফিস-এ আমার একটু আলাপ পরিচয় ছিল, যাঁহত করে তা লোপ পায় সেজন্য আমি সেদিকে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিয়েছি। আমার দিনগুলি সিংগাপুরের ছোট ছোট গলিতেই কাটছে। আমি বেঙ্গ ক্রমেই ভুলে যেতে লাগলাম আমিই একদিন পৌরী-ব্যক্তি কল্প সিংহ'র ছিলাম, মনে হতে লাগল আমিই একদিন

ভরঘুরের বিলাত বাজা

অভিমান একটা মহা মারাত্মক বিষয়। আমার মত অনেক লোক জ্বলিতে গলিতে অপরিচিত ভাবে জন্ম নিচ্ছে আর মরছেও। এদের কি আমার মত অহংকারী হওয়া উচিত? তারা অহংকার করতে পারে না কারণ তাদের অহংকার করার মত কিছুই নাই। আমি এই নিকুঠ ছোটদের মাঝে আরও দু'মাস কাটিয়ে এক দিন দিপিং অফিসে গিয়ে নিজের ফটো উঠিয়ে সাগরে ঝাবার “পেপার” ঠিক কবে নিলাম। সারেং ক্লান লাইনের একথানা জাহাজ যোগাড় করেছিল। ক্লান লাইনের জাহাজেব গমনাগমনের কোনও ঠিক থাকে না। যে দিক থেকে ডাক আসে সে দিকেই দৌড়ে যায়। সারেং যখন এই সংবাদটি আমাকে দিল তখন আমি বেশ সুখী ছলাম, কারণ এবার আমার জীবনের পরিবর্তন ভাল করেই হবে। কি রকম পরিবর্তন হবে তার একটু নমুনা দিচ্ছি। ছোট বেলা হতে ভাবতাম বিদেশীরা বিশেষ করে ব্রটনরা বড়ই নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু সমুদ্রতীরে এসেই দেখলাম, আমার সে ধারণা একদম বাজে। পরিবর্তনশীল জগতে রাজাই কিছু না পরিবর্তন হচ্ছে। আমরাই শুধু স্থবির হয়ে দিন কাটাচ্ছি। ব্রটনরা সময়ের পরিবর্তনে তালে তালে পা ফেলে ক্রমাগত নিজেন্নের আচারব্যবহার বদলাচ্ছে।

আজ আমি জাহাজে গিয়ে উঠব। আজ হতেই আমি বয়ের কাজ করতে আরম্ভ করবো। তারা আমার মনিব হবে তারা চায় পরিকার পরিচ্ছন্নতা। তারা চায় চলতি নিয়ম কাছন। তারা চায় বা মূলকমানের প্রধার লুগি, দাড়ি, টুপি ইত্যাদি দিয়ে কাজ করা। তারা চায় চলতি নিয়ম; যা মানুষে চায়। আমিও কোট-পেট্ট একটা পরিষ্কারই নেকটাই লাগিয়ে জাহাজে উঠলাম। জাহাজে

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

অনেকগুলি অফিসার ছিল। তারা সকলেই ইংরেজ। প্রত্যেক অফিসারের এক একটি বয় থাকবে তারপর খানার টেবিলের বয়, স্নানাগারের বয় আরও অনেক রকমের বয়ও থাকবে। মোট অফিসার ছিলেন ছয় জন আর বয়ের সংখ্যা ছিল পনের জন। এরূপ বয়-বাহুল্য-যুক্ত কোন জাহাজ আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। যে মুহূর্তে আমরা জাহাজে উঠলাম সেই সময় এক জন অফিসার এসে আমাদের দেখে নিলেন। আমাদের মাঝে দুজন পুরাতন বয় ছিল। জাহাজে উঠার দিন উভয়েই কাজের বাহুল্যে স্থির হতে পাচ্ছিল না। প্রথম অফিসার তাদের ডেকে নিয়ে সর্বপ্রথমে ক্রোড়ী হতে বললেন, তারপর তাঁরই তত্ত্বাবধানে ওদের স্নান করান হ'ল তারপর কাজে বাবাব আদেশ হ'ল। বুঝলাম এখানে সারেং-এর কোন আধিপত্য নাই। আরও কয়েকদিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম—সাবেং এবং তার সংগে যারা কাজ করে তাদের ইংলিশ অফিসারগণ জীব-জন্তুর মত গণ্য করে। খালাসী এবং আগুনওয়ালাদের বুকের উপর ভাঁড়াতাড়ি কাজ করে চলে যেতে হয়। বয়দের শোবার যায়গাও উপরেই ছিল। প্রকৃত পক্ষে খালাসীদের সংগে আমাদের কোন সংশ্রবই ছিল না।

লিংগাপুর হতে জাহাজ ছাড়তে আরও দুদিন বাকি ছিল। এরই মধ্যে গোয়ানিজ বয়রা বিদায় নিয়েছে, আমরা ওদের স্থান নিয়েছি। একদল সিলেটি এবং চাটগাঁয়ের লোক বিদায় নিয়েছে অল্পদল ভারতীয় সৈন্য নিয়েছে। বয়দের মাঝে যারা পুরাতন এবং অপরূপ কাজের কাজের ঠিক হয়েছে বাকি আটজন বয়ের কি কাজ করতে হবে তাই এখনও কিছুই ঠিক হয় নি। আমিও তাদের একজন। বয়দের মধ্যেইনে খুবই কম। মাত্র একজন টাকা, বয়রা বাজে কাজ করে

ভবঘুরের বিলাত বাজা

অফিসারদের মনস্তাট্ট ক'রে বেশ মোটা টাকা অর্জন করত। আমি সে পথের পথিক ছিলাম না। আমি দেশ বিদেশ বেড়াব, ভাল খাবার খাব আর সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে আমার শরীরের অবশাদ দূর করব এইটাই একমাত্র লক্ষ্য। হাত-খরচ বাবদ মাসে একশ টাকা যদি পাওয়া যায় সে ভালই তবে।

আমাদের মাইনে কিন্তু একশ টাকা ছিল না। আমাদের তিন মাসের মাইনে সারেংকে ঘুষ বাবদ দিতে হত। সি-ম্যান ইউনিয়নের টাকা দিতে হত। সিগাপুরের বাৎসরিক ঘর ভাড়া দিতে হত। এসব নানা হাবি জাবি দেবার পব হিসাব মতে মাত্র বাঁচত একশ টাকা। প্রতিবাদ করলে সাবেং এসোসিয়েশনের কালো খাতায় নাম উঠবার কথা ছিল। যার নাম একবার সারেংদের কালো খাতায় উঠে তাদের জাহাজে চাকরী পাবার আর উপায় থাকে না। সেজন্য এই অস্থায়কে সকলে মাথা পেতে নিত। আমি লগনে গিয়ে এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাই এবং তারই ফলে বোধহয় নাবিকদের বর্তমানে কিছুটা সুবিধা হয়েছে।

আমি একজন “ফালতু” বয় ছিলাম। সেজন্য সহরে গিয়ে ঘুরে ফিরে আসবার সময়ও ছিল। বিকালের সংবাদ-পত্র খানা কিনে দেখলাম আমাদের জাহাজ সিংগাপুর হতে সোজা সিড্‌নী গিয়ে পানামাথা পেরিয়ে বোষ্টন হয়ে লিভারপুল পৌঁছবে। মাঝে যদি কোনও পোর্ট হতে মাল নেবার জন্ত আটক পায় বা বাতিল হলে তখনকারী জাহাজের গতি পরিবর্তন করা হবে। মনে মনে ভাবলার যদি মাঝে জাহাজ চলে তবে আমার কিছুই দেখা হবে না।

সিড্‌নী “বাজার” খেতেই পাব। ব্যাংকে এখন আর চিন্তা করে কোন দায়িত্ব নেই। সেই টাইমস্ কাগজ খানা বস করে বগল দাবা করে কের

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

জাহাজে আসলাম। ত্রিভুজ দিয়ে ওপরে ওঠার সময় একজন অফিসার আমাকে দেখেই বললেন—

তবে তুমি বেশ ভাল ইংলিশ জানো বলেই মনে হয় ?

হাঁ মশায়।

বয়ের কাজ নেবার কারণটা জানতে পারি কি / অবশ্য সেক্ষেত্রে চিন্তা করার কিছুই নাই।

অনেকদিন বেকার ছিলাম মশায়, বয়ের কাজ বেশ ভাল করেই জানি।

পূর্বেই বলেছি তোমার চিন্তা করার কিছুই নাই, এখন আমি মনে করব তুমিও একজন মজুর যেমন আমরা, এর বেশী নয়, তা হলে বোধ হয় ভালই হবে।

সেটা আপনাদের অফিসেই মাত্র মশায়।

আমরা কোথায় যাচ্ছি বোধ হয় সংবাদপত্রে দেখেছ ?

হাঁ মশায় আগে সিডনী যাবে তারপর পানামা, তবে এর ত কোন ঠিকানা নাই কোথাও দরকাব পড়লেই জাহাজের গতি পরিবর্তন হবে।

যতার্থই তাই এদিকে আস আজকের সংবাদটা একটু দেখে নিই।

আমি অফিসারের হাতে কাগজ খানা দিয়ে বললাম, সংবাদ পত্র পড়া হয়ে গেলে কেবিনে রেখে দেবেন, আমি গিয়ে নিয়ে আসব তাই বোধ হয় ভাল হবে, কেমন নয় কি ?

অবিকল তাই।

মনে হল লোকটার “অবিকল তাই” বলার একটা ব্যঙ্গ আছে। কিন্তু সেক্ষেপ মনে করাটা আমার পক্ষে অসম্ভব হলেও...

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

মিঃ মরিসন বনিয়াদি ঘরের ছেলে। তাদের চাল-চলন পৃথক। সে
ওজন ক'রে কথা বলে এবং তার প্রত্যেকটি কাজ বনিয়াদী ধরনের
লোকের মতই। এরূপ বনিয়াদী ঘরের ছেলে জাহাজী কাজে খুব
কমই আসে। তবে লোকটার বনিয়াদী প্রকৃতি লোপ পেয়েছে।
তার মন স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে। সংবাদ-পত্র খানা ফিরিয়ে
আনতে ইচ্ছা করেই সেদিন তার কেবিনে গেলাম না। পরের দিন
সকাল বেলা যখন সেই অফিসারের সংগে দেখা হ'ল তখন তার কথার
ভাবে বুঝলাম লোকটি একেবারে আধুনিক ভাবাপন্ন।

সকাল পাঁচটার সময় আমাদের মালের জাহাজ সিংগাপুরের
বন্দর ছেড়ে বাহির-দরিয়ায় (হাই-সি) এসে পড়ল। জাহাজ বেশ
দুর্লভে লাগল। নব-নিযুক্ত বয়দের মাঝে অনেকেই সমুদ্র রোগে
আক্রান্ত হ'ল। আমারও শরীরটা কেমন করে উঠল। কিন্তু আমার
মনের জোরের প্রভাবে ঐ রোগটাকে বেশ ভাল ক'রেই ভুলে গিয়ে
বয়ের কাজে মন দিতে পারছিলাম। কতকগুলি ছুরি চামচ এবং কাঁটা
বালির সাহায্যে তক্তায় ঘবে পরিষ্কার করার কাজ আমাকে দেওয়া
হয়েছিল। বসে কাজ করাটা মোটেই আমার পছন্দ হ'ত না তাই
টেবিলের উপর যন্ত্রগুলি রেখে একটা চেয়ারে বসে কাজ করছিলাম।
আমার পরিচিত অফিসারটি আমার কাজের পদ্ধতি দূর থেকে অনেকগুণ
লক্ষ্য ক'রে শেবটায় কাছে এসে বলল—

তুমি কি কোন ভদ্র পরিবারের ছেলে ?

আমার কাজ দেখে আপনার কি মনে হয় ?

স্বামি মনে করি তুমি কোন ভদ্র পরিবারের লোক মিলকরই হবে।

তোমার ধারণা ঠিক হয়েছে।

আমার শ্রমকে তোমার কি ধারণা ?

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

আমার মনে হয় তুমিও কোন আদব-কায়দা-জানা শিক্ষিত প্রাচীন পরিবার হতে এসেছ।

তোমার ধারণা “অবিকল ঠিক” হয়েছে। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, বোধ হয় তাতে তুমি রাগ করবে না, আমি বুঝতে পারিনি তুমি, কি করে এই উত্তাল সাগরে নীরবে কাজ করতে পারছ। তোমার কাগজ আমি দেখেছি তাতে বুঝলাম তুমি ধর্মে মুসলমান, সত্যি কি তুমি বাংগালী মুসলমান?

না মশায়।

তুমি ছদ্ম নাম নিয়ে জাহাজের কাজে এসেছ বলেই মনে হয়!

অবিকল তাই।

নাম বদলাবার কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কোনও ভদ্রঘরের ছেলেকে জাহাজের কাজে ভর্তি করা হয় না বলেই আমাদের ছদ্ম নাম গ্রহণ করতে হয়েছে।

অফিসার আর কোন কথাই বলল না। আমিও আমার কাজে মন দিলাম। সময় কাটতে লাগল। খানা-পিনা দেওয়া হ’তে আরম্ভ করে জুতা পরিষ্কার করা পর্যন্ত বেশ হাসিমুখে এবং সহজেই ক’রে যেতে লাগলাম। সমুদ্র রোগ আমাকে মোটেই কাবু করতে পারল না। রাত্রে বেশ ঘুম হল। পরের দিন সকাল বেলাও পূরাদমে কাজ চালিয়ে দুপুর বেলা একটু ফুরসৎ পেলাম। ইচ্ছা হ’ল দেখে আসি জাহাজ কত নট (নামুজিক মাইল) চলে এসেছে। প্রথম ইন্জিনিয়ারের কেবিনে সেই চার্ট ছিল। দেখলাম আমাদের জাহাজ আন্দামানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং দিন রাত চলে যাত্রা একশত ষাট মাইল এগিয়েছে। বাইরে এসে উপরের আকাশ এবং সমুদ্রের জলের দিকে তাকালাম। আমার মনে হ’ল এমন সুন্দর আর কিছু দেখিনি।

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

বড় বড় ঢেউ উঠছিল। ঢেউগুলি ভেংগে বাবার পূর্বে তার উপর ছোট ঢেউ উঠছিল, সে ঢেউ হতে বাতাস জল উঠিয়ে আকাশে ছিটান ছিল তারপর যখন সে জল নীচে পড়ছিল তখন তা দেখে মনে হচ্ছিল কি হুন্সর প্রাকৃতিক ফোয়ারা। সে ফোয়ারা নিমেষে জন্ম নিয়ে নিমিষে লয় পাচ্ছিল। উড়ুচ্ছ মাছগুলি দলে দলে জাহাজের আগে এবং পিছনে ছুটাছুটি করছিল। অনেক দূবে বড় বড় মাছ জাহাজের শব্দ শুনে কখন ভেসে উঠছিল আর কখন বা জাহাজের দিকেতে তাড়া করে আসছিল। জাহাজ আপন লক্ষ্যপথ হাতে একটুও অগ্র পথে না গিয়ে ঠিক পথেই চলছিল। মাছগুলি যেন জাহাজকে ভয় করেই গভীর জলে আত্মগোপন করছিল। ক্লি চমৎকার সে দৃশ্য। অনেকক্ষণ বসে তাই দেখলাম তারপর উঠে আসলাম। কাজ আমাকে টেনে নিয়ে এল। আমার কাছেও একটা পকেট বাড়ি ছিল।

নবম দিন সকাল বেলা মস্ত বড় একটা পাহাড় আমাদের সামনে ভেসে উঠল। পাহাড়টা হঠাৎ ভেসে ওঠেনি। পাহাড়টা ছিলই তবে পৃথিবী গোল বলেই আমরা দূর হ'তে তা দেখতে পাচ্ছিলাম না। পাহাড়টা ক্রমেই বেশ পরিষ্কার দেখাতে লাগল। জাহাজ ক্রমেই পাহাড়ের কাছে যেতে লাগল। জাহাজ যখন পাহাড়ের কাছে গেল তখন একজন বয় আমাকে বলল এটা হল পোর্ট ব্রেনার। এখানেই আমাদের দেশ হতে লোক এসে দীপান্তর বাস করে। এখানে নামবার কারো অধিকার নাই। আমরা কেউ এখানে নামতে পারব না, এমন কি জাহাজ জেটিতে ভিড়বেও না। কতকগুলি বড় বড় পাখা বোট এসে আমাদের জাহাজ হতে তাদের মাল উঠিয়ে নেবে। কয়েকটা বোট তাই আছে। কয়েকশালা পাখাবোটকে একটা ট্রিম লান্চ, কয়েকশালা

ভবঘুবের বিলাত যাত্রা

আমাদের কাছে রাখল। গাধা বোট হতে কতকগুলি কালো লোক
নেমে এসে আমাদের জাহাজে উঠল তারপর সামান্য কয়েকটি ব্যাগ
নিয়ে ফের গাধা বোটে গিয়ে নামল। লোকগুলিকে দেখে মনে হল
তারা যেন নিগ্রো হবে। আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামালাম না।
নিজের কাজে ব্যস্ত থাকলাম। জাহাজ যখন আবার ছাড়বার সময় হল
তখন ফের বাইরে ত্রিজের উপর দাঁড়িয়ে পোট ব্লেয়ারকে ভাল করে
দেখে নিলাম আর মনে মনে নানা কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

কিসের সে চিন্তা? আমার কোন আশ্রয় কি এখানে এসেছে?
না, কেউ আসেনি, তবে কেন চিন্তা? শুধু চিন্তা নয়, বেশ অল্পতাপ,
কষ্ট, বেশ মর্মস্পর্শী অল্পভূতি। জাহাজ যতই দূরে সরে যেতে
লাগল ততই সমুদ্রের জল কালো হতে লাগল, ততই আমার সংগে
আন্দামানের সংস্পর্শ যেন ছিঁড়ে যেতে লাগল। আমি তা ছিঁড়তে
চাচ্ছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম আন্দামান আমার অন্তরের অনন্দ-
মহল হয়ে থাকে। এখানে আমার দেশের কত স্বদেশ-প্রেমিক
পলে পলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে আর তাদের শেষজীবনের শেষের
দীর্ঘনিঃশ্বাস কবে চিরতরে বের হবে তারই কথা ভাবছে। আমরা
দূরে থেকেই তাদের বাহবা দিয়েছি কিন্তু তাদের অন্তরের
বেদনার একবিন্দুও কি অনুভব করতে পেরেছি? কিছুই না।
শ্রাবণবণতার উৎপত্তি যেমন পলকে হয় তার নিবৃত্তিও এক মিনিটেই
শেষ হয়। আমাদের জাহাজ হঠাৎ মোড় ফেরাল। প্রাপেলারটা
কড় কড় করে উঠল। আন্দামান অদৃশ্য হল, আমরা নতুন পথের
পথিক হলাম। আমি ভাবলাম। হয়ত জাহাজ এবার কলম্বো
যাবে। কিন্তু কলম্বো এখান হতে অনেক দূরে। আন্দামান হতে
কলম্বো যেতে হলে পথে আর কোন পোটই আসবে না।

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

যে কয়লা নেওয়া হয়েছে তা অতি সামান্য। জলও ফুরিয়ে যাবে।
আট নয় দিনের মধ্যে কোনও বন্দরে জাহাজ পৌঁছানো চাই-ই।

বয়ের কাজ আর কেরানীর কাজ একই কথা। অফিসারদের
ঘর কাঁচ দেবার সময় তাদের কাগজ পত্র গুছিয়ে রাখতে হয়, কিন্তু
তাদের কাগজে কি লেখা আছে তা দেখতে নাই যদি কাগজপত্র
দেখবার মন নিয়ে কাজ করা যায় তবে মনের পরিবর্তন হয়, মুখ
শুকিয়ে যায়, চোখের দৃষ্টিভঙ্গি বদল হয়। আমি কখনও সেরূপ
কাজ করতাম না বলেই আমার মুখের আকৃতি কখনও বদলি হত
না। কিন্তু আমারই সমব্যবসায়ীরা অনর্থক কাগজপত্র বাটতে
ভাল বাঁসত বলে প্রায়ই অপমানিত এবং নির্জাতিত হ'ত।
আমার সংগের বয়দের অপমানিত হতে দেখে দেখে একদিন আমারই
কেবিনে একটা সভা করলাম এবং প্রত্যেক বয়কে বললাম “একুপ
অফিসার কাজ বেশ ভাল। আর না করে।” আমার উপদেশে কিছুই
হল না। চিন্তা করতে লাগলাম বয়দের বিরূপে ছোট ছোট অফিসার
কাজ হ'তে বিরক্ত করা যায় এবং বিরূপে তাদের মুখে হাসি ফুটানো
যায়। নানা রকমের উপায় বের করতে সক্ষম হলাম বটে কিন্তু
কাজে লাগবার মত কিছুই বোগাডু হল না।

অনেক দিন পর আবার সেই অফিসারটির সংগে সাক্ষাৎ হ'ল।
তঁার কেবিনে আমার দেওয়া সংবাদপত্রখানার কথা তুলেই গিয়েছিলেন।
সেখা হওয়া মাত্র অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—

সময় কখন কাটছে?

কিছু ভালই বহান্নর।

কিছুকাল সাঙ্গর একই খান্ড নীল তার কাগজ ভাল!

ভবঘুরের বিলাত বাত্রা

জানি বই কি, সাগর যেখানেই বেশী গভীর হয়েছে সেখানেই সাগরের জল গাঢ় নীল দেখাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে জল নীল নয়, স্বচ্ছ।

আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি জানো কি ?

না। জানতে ইচ্ছা হয় নিশ্চয়ই, তবে সে সুরোগ আমাদের নাই।

কেন চাট দেখলেই পার।

চাট থাকে প্রথম ইন্জিনিয়ানের কেবিনে, তা আমি দেখেছি, তবে চাট দেখতে ইচ্ছা হয় না, কি জানি তাতে কোন গোপনীয় সংবাদও থাকতে পারে।

আমদেব হ'ল মালের জাহাজ, আমাদের পথ গোপন রাখার কোন মানেই হয় না। তবে শুনে বেধো আমরা সুরাবায়া যাচ্ছি। সেখানে প্রচুর মাল ওঠাতে হবে। এখন আসি। সুরাত্রি।

অফিসার চলে গেল, আমিও আমার কাজে গেলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদেব জাহাজ একে বেকে বলিষীপ ডাইনে ঝেঁথে সুরাবায়াতে এসে উপস্থিত হ'ল। মালবাহী জাহাজে বেশ একটা সুবিধা আছে। যেই জাহাজ কোন বন্দরে আসে অফিসারগণ বন্দরে চলে যায় এবং বয়সের কয়েক দিনের জন্য একটানা ছুটি মিলে। আমিও সুরাবায়াতে পৌঁছে শহরে বেড়াতে গেলাম। তবে আমি যখনই পরিভ্রাম্য হতাম তখনই জাহাজে ফিরে এসে বিশ্রাম করতাম এবং পতীর রাত্রে কখনও শহরে থাকতাম না।

সুরাবায়া ছোট বন্দর। জাহাজে ব'ারা বেড়াতে আসেন তাঁরা সুরাবায়াতে সামান্য সময় থেকেই রেলপাড়িকে করে বৌদ্ধধর্মের ভূপ দেখতে যান। আমাদেবের পক্ষে দূরে বাওয়া সম্ভবপর ছিল না, সেজন্য কাছেরই দু-একটা ভূপ দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। কয় ব'ারটির কাজ করে বেশী আড়বর করা সম্ভবপর নয়। এইদের কাছেই একটা ছোট

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

ভূপ ছিল। একটি লোককে জিজ্ঞাসা করে পথ জেনে নিয়ে সেখানে গেলাম। ভূপটি বেধেই মনে হল এটা একটা হিন্দু মন্দির, পরে হঠাৎ গৌড় ভূপ হয়েছিল। বর্তমানে হয়েছে মসজিদ। মসজিদ করতে জাতানিজরা মন্দিরের পাথর খুলে পশ্চিমবর্তন অথবা পরিবর্তন করেনি। অগ্ন্যান্ত দেশে কিন্তু তা হয়নি, পুর্বাতন কাঠামোটা হয় তেংগে ফেলা হয়েছে নয়ত তাতে কাট ছাট করা হয়েছে। মালয় দেশে তার একটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। মালয়রা শুধু কয়েকটা কবর ক্ষুদ্রে তাতে কয়েক জন লোককে গোর দিয়ে তারই উপর কয়েকটি আরবী অক্ষর ছেড়ে দিয়েছে মাত্র। পরিবর্তন এইটুকুই।

সুরাবায়া শহরে মালয় ছাড়া ও মালয় বেশধারী কতকগুলি কালো লোক দেখতে পাওয়া যায়। তাদের সংগে কথা বলার চেষ্টা করে কোন উত্তর পাইনি। একজন গুজরাতীকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম এরা মাকি আরব। গুজরাতীর কথায় আমার বিশ্বাস হয়নি। পরের দিন একজন মালয়কে কালো লোকগুলির পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। মালয় লোকটি বলেছিল এরা ইল সমুদ্রতীরবাসী আরব। এদের ভাষা আরবী। এরা কখনও মালয় অথবা জাতানিজ বলে পরিচয় দেয় না। এদেশে এরা লগুনীর কারবার করে, সেজন্য এদের কেউ ভালবাসে না।

জাভা, সুমাত্রা, মালয়, বর্ণিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপে বান্ধা বান্ধা করে তাদের আমি মালয় বলে ধরে নিলাম, কারণ এদের ভাষা হল মালয়। পর্যটকগণ কিন্তু তা বলে না। উইলসন ডাচ এবং ফ্রেন্সদের অজ্ঞকরণে জাতানিজ, বাসীনিজ ম্যালে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

ভূপ হতে ফেরার পথে একটি মালয় পাড়ার দিগে মালয়রা কেমন করে বাস করে তাই জানতে ইচ্ছা হ'ল। এদিকে পা আর চলছিল না। সিংগাপুর, পিনাং প্রভৃতি স্থানে রিকসা পাওয়া যায়। এখানে

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

তা পাওয়া যায় না। চীনারা এখানে রিক্সা টানেনা। এখানে চীনারা কেন রিক্সা টানেনা তার সন্ধান নিতে প্রযুক্তি হ'ল। অনেকগুলি চীনাঁকে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কেউ আমার কথার জবাব দিল না। শেবটায় পথ চলে কাতর হয়ে এক জাপানীজ ডাক্তারের ডিস্পেনসারীতে গিয়ে বসতে বাধ্য হলাম। ডাক্তার বড়ই আমোদ প্রিয় লোক। তিনি ভেবেছিলেন আমি কোনও ছুঁট রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি, কিন্তু যখন জানলেন পথ চলে কাতর হয়ে বিশ্রামার্থে তাঁর ঘরে আশ্রয় নিয়েছি তখন তিনি আমার সংগে বেশ ভদ্রভাবেই কথা বলতে লাগলেন। ডাক্তার সংবাদ প্রিয়। অনেকগুলি রোগী এল আর গেল, তিনি কিন্তু কারো দিকে তাকালেনও না। কম্পাউণ্ডারই সকল কাজ করল। ডাক্তার আমাকে পেয়ে খুশী হলেন এবং দুপুর বেলা আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন।

মাস্তুর পুরাতনকে বড়ই ভালবাসে। ডাক্তার বড়ই পুরাতন-প্রিয়। কোন যুগে ভারতের সংগে তাঁদের সন্ধর্ভ ছিল তাই নিয়ে তিনি আলোচনা করতে লাগলেন। ডাক্তার তথাকথিত ধর্ম মোটেই মানেন না। তাঁর ঘরে আরবী ভাষায় লেখা একখানা কাগজও ছিল না। জাতানীজরা প্রায়ই তাদের ঘরের দরজায়, দেওয়ালে নানারূপ আরবী পদ্ম ক্রেম করে বাঁধিয়ে রাখে। ডাক্তারের ঘরে সেরূপ কিছুই ছিল না। ডাক্তার পুরাতনে কিরে যেতে চান। তাঁর কেন এমন প্রযুক্তি হল তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি চট করে বললেন, খুঁটান, বৌদ্ধ হিন্দু জৈনের মাঝে কুসংস্কার আছে বটে তবে কোনরূপ বন্ধন নাই। হিন্দু বলতে তিনি বলি ধীপের হিন্দুদেরই বুঝেছিলেন। বলি ধীপের হিন্দুরা বেশ স্বাধীন। তারা যা খেয়ল হয় সব করতে পারে তাই বার। যাদের দিক থেকেও তাদের কোন বন্ধন নাই। তারা বলে তার সংস্কার বিলাত

ভবঘুরের বিলাস বাজা

সম্বন্ধ করতে পারে। তাদের মাঝে এখনও মিথিল বিবাহ প্রচলন আছে এমন কি 'ইকর' (ইকর-সংযোগ, একত্রে বাস) প্রথাও আছে। তাঁদের তা ছিল না, নিকে করতে হলেও একজন মুসলমান পাদরীর দরকার হয়। এসব ধর্মের বন্ধন তাঁর কাছে মহাকষ্টকর বলেই মনে হ'ত। তারপর ভাবার দিক দিয়েও তিনি এমনি কতকগুলি ইংগিত করলেন যাতে কবে বুঝলাম তিনি সংস্কৃত ভাষার বড়টুকু পুরুপাতী আরবী ভাষার দিকে সেরূপ স্পৃহা তাঁর নাই। তাঁর কথা শুনে আমি কোনরূপ মন্তব্য কবিনি কাব্য? আমি বেশ ভাল করেই জানতাম এসব কথার কোন মূল্যই নাই। তাঁর কথা শোনা হয়ে গেলে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বলুন ত এখানে চীনারা বিকসা টানেন না কেন"? ডাক্তার বললেন, এদেশে গরীব চীনা একদম আসতে পারে না, সেজন্যই এখানে রিক্সার প্রচলন হয় নি। ডাচদের অধীনস্থ দেশে আসতে হ'লেই মোটা টাকা জমা রাখতে হয়। গরীব চীনারা সে টাকা দিতে সক্ষম হয় না। এদেশে গরীব চীনাদের প্রবেশ নিষেধ।

বিদেশ থেকে গরীব না হয় না আসল, কিন্তু এখানকার গরীবরা ত আর বিদেশে চলে যায় নি। এদেশে গরীবের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে এবং তাঁরই কলে নানারূপ পাপ এসে দেখা দিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাক্তার এমন কতকগুলি কথা বললেন যা বলতেও আমার প্রশ্ন কাঁপে। প্রকান্তভাবে স্বামীর বর্তমানে জী অন্তের বাড়ীতে চাকরাণীর কাজ করে। এদেশে চাকরাণীকে নানা কাজ করতে হয়। গণিকায়ুজি তাঁর অন্তর্গত। একথাটা সকলেই জানে অথচ এরূপ অত্যন্ত কাজের প্রতিবাদ কেউ করে না। তারা ভাল করেই জানে এরূপ পাপের ফল ভাল হয় না এবং যে পর্বত আর্থিক উন্নতি না হয় সে পর্বত আইন করে কোন রূপই হবে না। ডাক্তার বুঝে করে বললেন, "স্বামীর এ

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

অবস্থার অন্ত আমরাই দায়ী। আমাদের এখানকার লোকে ভাবে যদি দুঃখ কষ্ট করে একবার মক্কা ঘেতে পারে তবেই সকল পাপের অবসান হবে এবং মরলে পরে নিশ্চয়ই স্বর্গবাস হবে।" বলির লোক কিন্তু সেক্ষেপে কিছুই ভাবে না। তারা ১২০২ সাল হতে আরম্ভ করে ১২১২ সাল পর্যন্ত ডাচদের সংগে যুদ্ধ করেছে। এতে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, অনেক লোক মরেছে, কিন্তু ডাচরা বুঝতে পেরেছে এদের দাবিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাদের মক্কা বলে তীর্থ স্থান নাই। স্বর্গে যাবার লোভও নাই। তারা তাদের দেশের প্রত্যেক বালুকণাকে স্বর্গ বলে মানে এবং সেই স্বর্গভূমিতে যাতে অন্ত কেউ এলে হুকুম না করতে পারে সেজন্য তারা প্রাণ দেয়।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম তবে কি বলির লোক স্বাধীন?

নিশ্চয়ই তারা স্বাধীন। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ডাচরা মোটেই হাত দেয় না।

ডাক্তারের কথা শুনে আমার হাসি পেল। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ডাচরা বলি দ্বীপবাসীদের কাজ-কর্ম হাত দেয় না, বাইরের ব্যাপারে নিশ্চয়ই হাত দেয়। ঘুরিয়ে কিরিয়ে বলি দ্বীপবাসীরা পরাধীন। তবুও এত ছোট দ্বীপের অধিবাসী আজও মাথা উচু করে আছে কেনে স্থধী হলাম।

আমাদের জাহাজ সুরাবায়াতে মাত্র বারোঘণ্টা ছিল। বার ঘণ্টার মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা ডাক্তারের বাড়ীতে ছিলাম। ডাক্তারের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে আরও কতকগুলি পথে পথে বেড়িয়ে জাহাজে ফিরে এসে নিজের কাজে মন দিলাম। সকাল না হতেই জাহাজের নংগর উঠিয়ে হংকং-এর দিকে রওনা হই। অনেক দিনের

ভবধুরের বিলাত যাত্রা

প্রথম বাসিনা ছিল হংকং এবং সাংহাই দেখব, এবার হয়ত তাই দেখার সুযোগ হবে ভেবে মনটা আপনি নেচে উঠল। শরীরে শক্তি এল। কাজে কর্মে উৎসাহ হল। খাওয়া দাওয়া এবং শরীরের ওজন বাড়তে চলল।

চীনসমুদ্র দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তর এবং দক্ষিণ। চীনারা দক্ষিণ সমুদ্রের বড়ই প্রশংসা করে। প্রশংসা করাব অনেক কারণও আছে। পূর্বকালে চীনারা অপরের প্রতি বেশ অত্যাচার করত। সে অত্যাচারের মাত্রা এখন কমেছে। অত্যাচার নাই বললেও চলে। অত্যাচার যদিও কমেছে তবুও চীনাবা এখনও বড় বড় নৌকা নিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে বেশ চলাফেরা করে। আমরা পংগা সাগরে যেতেই ভয় পাই। আমাদের জেলেরা সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরে না। চীনারা কিন্তু সেরূপ নয়, এখনও নৌকা—বাকে ‘তংকাং’ বলা হয়, তাই নিয়ে উত্তাল সমুদ্রতরংগে হাবুডুবু খেয়েও বেঁচে থাকে। সমুদ্রে জাহাজ ডোবার কথা শোনা যায় কিন্তু চীনা নৌকা কখনও ডোবে না। চীনা নৌকা গভীর সমুদ্রে কখনও বাতাসে উল্টা দিকে চাপ্তাশো হয় না। যখন সমুদ্রে ঝড় ওঠে তখন পাল নামিয়ে দিয়ে হাল ধরে বসে থাকে। নৌকা বাতাসে যে দিকে ঝড়টুকু ইচ্ছা নিয়ে ঝাক তাতে তারা একটুও ভয় করে না। এরূপ সাহস থাকার কারণ চীনারা বড় বড় নৌকার সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় আমেরিকানদের বহু পূর্বেই কালিকরমিয়ার পৌছাতে সক্ষম হয়। আগে পৌছলে কি হবে, চীনাদের মাঝে একতা ছিল না অথবা সমাজ স্থাপন করে বসে বসে কল্যাণ ও মঙ্গলব ছিল না, সেই জন্যই চীনারা আমেরিকানদের মাঝে ঈর্ষান্বিত ও অত্যাচারিত হয়ে কালিকরমিয়ার হারানোর কারণ হয়।

ভবনুরের খিলাত যাত্রা

লোকে বলে কালিকরগিয়ায় চীনাদের সাগর-অঙ্গে ডুবিয়ে দাওয়া হয়েছিল। বিশ্বস্তমূরে অবগত হয়েছিলাম চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্বে চীনারা বৈকাল হ্রদের তীরে অবস্থিত চীতা নামক সহরেও বসবাস করত, কিন্তু মুষ্টিমেয় কসাক তাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এখনই কোন চীনা পবিবারকে কসাকরা লোপ ক'রে দিত তখন তারা বলত “আমরা সোনার খনি হতে কিরে এসেছি।” এর মানে হ'ল চীনাদের পবিদেষ এবং তাদের সনচিত টাকা পয়সা চীনাদের হত্যা করার পর সন্ধান করে বেশ পাওয়া যেত। যে অগভের লোক প্রথম বারদ আবিষ্কার করেছিল তারাই কসাকদের হাতে কুকুর-বিড়ালের মত নিহত হয়েছিল। তাদের ছুরদৃষ্টি না থাকার জন্যই তারা দীপময় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সর্বত্র বিচরণ করেও কারো কাছ থেকে কোনরূপ সহায়তুতি পেত না। চীনাদের বসবাস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল।

আমাদের জাহাজে একটিও চীনা ছিল না সেক্ষেত্রেই জাহাজের ত্রিভুজ সর্বদা সকলের জন্য খোলা থাকত। যে সকল সওদাগরী জাহাজে চীনারা কাজ করে সেই জাহাজগুলির ত্রিভুজ সর্বদা বন্ধ থাকে এবং বাতাস করে কোনও চীনা সেদিকে না যেতে পারে তারও উত্তর ব্যবস্থা থাকে। দক্ষিণ সাগরে পৌঁছার পর প্রায়ই চীনা জাহাজ তৎকাং এবং ছোট ছোট সামান্য দেখতে পেতাম। উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গে তারা ভেসে চলেছে। তাদের চলার গতির নির্ণয় নাই। তারাও ব্যবসারেই বের হয়েছে। তাদের একের অস্তে নিবাস নাই। জ্বালাপ পেলেই এক নৌকা অন্য নৌকাকে আক্রমণ ক'রে খণ্ড-সর্বশ্ব কেড়ে নিয়ে দাবিদের হত্যা করে। যেকোনো নৌকা অনেক সময় দক্ষিণ সমুদ্রে অবশ্যে কোন দিকে

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

এটাকে পশ্চিম দেশীয় লোক বর্বরতাই বলে। কিন্তু বিস্কে উপসাগরে সেরূপ দৃষ্টান্ত আজকাল অবশ্য দেখা যায় না, পূর্বে সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। চীনারা বিশৃংখল জলদস্যু আর বিস্কে সাগরের ষ্টিক বোটগুলি স্রশৃংখল দস্যু এর বেশী কোন পার্থক্য নাই।

ক্রমাগত কয়েক দিন চীনাদের নৌকা দেখে দেখে আর তা দেখতে ভাল লাগত না। অবশেষে কখন গিয়ে হংকং পৌছাব তাই নিয়ে গবেষণা করতে লাগলাম। কিন্তু গবেষণা বেশীদিন করতে হল না। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা আমাদের জাহাজ মোড় ফিরলো। সামনেই একটা বড় পাহাড় দেখতে পাওয়া গেল। অনেকক্ষণ সেই পাহাড়ের দিকে চেয়ে থেকে লোক জনের অথবা লোকালয়ের অস্তিত্ব বুঝতে পারলাম না। ক্রমেই জাহাজ নিকটে আসতে লাগল। তবুও কিছুই দেখতে পেলাম না। পূর্বের দৃশ্যই পেলাম। দু'এক খানা সামপান্ বাওয়া-আসা করছিল। তারা কোথা থেকে আসছে আর কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিলাম না। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই কের জাহাজ মোড় ফেরাল। এবার লোকের বসতি, অস্তিত্ব জাহাজের আসা বাওয়া দেখতে পেলাম। ক্রমেই জাহাজ একটা ছোট প্রশালীর ভেতর দিকে প্রবেশ করতে লাগল। ই-দিকে মস্ত একটা পাহাড়ের গায়ে, হাজার হাজার লোকালয় দেখতে পাওয়া গেল। অনেকগুলি জাহাজ লংগর করে আছে তাও দেখতে পেলাম। আমাদের জাহাজও নংগর করল। নানা রকমের সামপান্ আমাদের জাহাজ ঘিরে দাঁড়াল। চীনা জীলোক পরিচালিত সামপান্ দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। মেয়েলোক নৌকা চালাতে পারে সে ব্যাপার আমার ছিল না। নানা রকম ভংগি করে, নানা রকমে ইংরেজী উচ্চারণ করে তারা আমাদের শহরের জন্ত ডাক দিয়ে

ভবঘূষের ঝিলাত যাত্রা

কয়েক জন অফিসার তীরে যাবার জন্য সাম্পানে নামলেন। বয়, কুক এবং অন্ত্রাণ্ড নাবিক নামতে পারল না কারণ তাদের হাতে অনেক কাজ ছিল। আমিও কাজে বাঁস্তু ছিলাম।

সন্টার পূর্বেই অফিসারগণ শহরে চলে গেলেন। আমিও তীরে যাবার জন্য অতি যত্নে রক্ষিত স্ট্রট পরিদর্শন করে ডেকে এসে দাঁড়িলাম। আমার সামনে এক অপক্লপ দৃশ্য ভেসে উঠল। সামনে মস্তবড় একটা পাহাড় আর তার সর্বত্র বিজলী বাতি ঝিলমিল করছে। পাহাড়টাকে অন্ধকার আকাশ বলেই মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকার আকাশে অসংখ্য তারা ঝক ঝক করছিল। কল্পনা অনেক করলাম কিন্তু বাস্তব কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছিল, আমার সাম্পানে এস, আমি তোমাকে বহন করেই তীরে নিয়ে যাব। যদি ইচ্ছা কর তবে তোমাকে তোমার ইচ্ছার মত স্থানও দেখিয়ে দেব। কোথায় আকাশ আর তারকা রাজি, আর কোথায় অগ্নকণ্ঠে বিকট ভাবে নিজের শরীর বিক্রয় ব্যবস্থা। কোন-রূপ দর-দস্তুর না করেই একটা সাম্পানে উঠলাম এবং তীরে গিয়ে একটি ভারতীয় টাকা সাম্পান পরিচালিকাকে দিলাম। পরিচালিকা নানা কথা বলতে বাচ্ছিল কিন্তু আমি সেদিকে কান না দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে পথ চলতে লাগলাম। পথের পাশে শিখ এবং পাঠান পুলিশ চীনাদের দিকে চেয়ে কি করে তাদের দোষ বের করে তাদের আইনের কবলে ফেলতে পারে তারই চেষ্টা করছে। মদগবের্ গর্বিভ হরে ইউরোপীয়ানরা প্রাইভেট মোটরে একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যাচ্ছে। একটু দূরে গিয়েই দেখতে পেলো রকম রকমের পণ্য জব্বা বিপনীরা জিতে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। চীনা স্তম্ভরীরা তাদের প্রিয়তমদের সংগে বেতে বেতে সেই স্তম্ভরীর জব্বা কিনে বিক্রি অহরোধ করছে। পথের দুটিকে ফুটপাথ। ফুটপাথ

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

ধরে অনেক পথচারী চলাছে। অনেকেরই ছিন্ন বস্ত্র। অনেকে রেশমী পোষাক পরে দ্রুত পদ-নিষ্ক্ষেপে দোকান হতে দোকানান্তরে চলে যাচ্ছে। পথে ঠিক মাঝখান দিয়ে ট্রলি বাস চলে যাচ্ছে। ট্রলি বাসে নানা দেশীয় লোক বসে হুদিকে বদন্ত দেখছে। ধনী গরীব সমভাবে কেউ পেটের খোরাক আর কেউ মনের খোবাক অশ্বেন করছে। সকলেই ব্যস্ত। সকলেই যেন চায় কিছু কুড়িয়ে পকেটস্থ করতে কিন্তু সেই ছড়ানো জিনিষই বা কি এবং কি করেই তা কুড়াতে হয় তার সন্ধান কটা লোক জানে?

হংকং-এ নতুন বলে আমার কাছে কিছুই ঠেকল না। ঝাঁরা সিংগাপুর দেখেছেন তাদের কাছে হংকং নতুন নয়, পুরাতন। কিন্তু এই পুরাতনের মাঝেই আমি নতুন কিছুর অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। নতুন কিছুই পেলাম না। পলিটিক্স সকলে করে না। চীন দেশের পলিটিক্স অগ্র ধরণের। পলিটিক্স ঝাঁরা করে তারা, যে পর্যন্ত ক্ষমতা তাদের হাতে না আসে, সে পর্যন্ত তাদের দেখা কেউ পায় না। আমার এদিকে কোনরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করা ধুইতা হবে মনে করে অগ্রান্ত্র বিষয়ে মন দিলাম।

আমাদের দেশের লেখকগণ প্রায়ই বিদেশী লেখা অনুবাদ করে অথবা বিদেশী চশমা চোখে দিয়ে চীনদেশ দেখেন এবং তাঁদেরই কথা নানা ভংগিতে লিখে বাহাজুরী অর্জন করতে চেষ্টা করেন। সন্ধ্যার পর থেকে আরম্ভ করে রাত্রি দুটা পর্যন্ত হংকং শহর বেড়িয়ে কোথাও বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম না। আমাদের দেশের গণিকারা যেমন দরকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এখানেও ঠিক সেইরূপ।- মারিক দেখলেই কতকগুলি অসং লোক নাবিকদের অসং স্থান দেখাতে নিয়ে যায়। আমাকেও টানা হেঁচকা করেছিল। ঝাঁরা একদা দেখেই

অবযুরের বিলাত বাজা

একটা জাতের উপর কাদা ছোঁড়েন তাঁরা নেহাৎই 'ভাল মানুষ'। তাঁরা জানেন না, পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্যই ক্ষুধার্ত খারাপ কাজ করতে দৌড়ে আসে। এসব ভালমানুষের দল যেমন কুকথায় পঞ্চমুখ তেমনি তাঁরা তাদের অজানিত ভাবে সমাজের সমূহ ক্ষতি করেন। লেখক গল্প লেখে, গল্প অত্যাাদ করে যদি চিরঞ্জীবী হতেন তবে এ সংসারে লেখকের নামের সংখ্যা অগনিত হত।

রাত আড়াইটার সময় যখন জাহাজে ফিরলাম তখন কেউ জেগে নেই। শুধু ব্রিজের কাছে একটি মাত্র লোক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল।

হংকং-এ অনেক মাল নামান হ'ল এবং কতক মাল বোকাইও হল। এতে তিনটা দিন কেটে গেল। প্রত্যেক দিনই শহরে যেতাম এবং ঘুরে আসতাম। দিনের বেলায় হংকং তত ভাল বলে মনে হ'ল না। তবে কতকগুলি বিষয়ে চীন্দাদের সংগে আমাদের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে বলেই মনে হল। যেমন পাল্‌কীর ব্যবহার। চীনারা ঠিক ঠিক পাল্‌কী ব্যবহার করে না তবে ঐ ধরনের একটা যান চারজন লোক বয়ে নিয়ে যায়। যে লোকটাকে চারজন লোক বয়ে নিয়ে যায় তাকে দেবলে রোগী বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় লোকটা ধনী এবং ভোগী। পৃথিবীর মাঝে ভারতবর্ষে এবং চীন দেশেই ভোগীরা নিজের মানইচ্ছত ভুলে গিয়ে নিজের জাতকে খাটো করে নিজেরা বেশ ভোগ করছিল এবং করেছে। পৃথিবীর অন্য কোন জাত এরূপ বর্বরোচ্ছিত ব্যবহার নিজের জাতের লোকের উপর করেনি। পাল্‌কী প্রথা বর্বরতার বিশেষ একটি দৃষ্টান্ত। চীন দেশেই সব বর্বরতার প্রচলন হয়। কারণ চীনদেশে এই বর্বরতা প্রচলিত হয় লোকরাই যদি অন্যদের জীবন ধারণ করে।

ভব ঘুরের বিলাত যাত্রা

কোনও এক যুগে কোন ইউরোপীয় লেখক লিখে গেছেন চীন দেশের লোক নৌকায় বাস করে। একথাটা মোটেই সত্য নয়। লোকে নৌকাব সাহায্যে এক স্থান হতে অল্প স্থানে যাওয়া আসা করে মাত্র। তাঁরে গিয়ে বাস করার সুযোগ না পেলে নৌকায রাত্রে ঘুমিয়ে থাকে। এরূপ নৌকায় ঘুমিয়ে থাকা নদী-বহুল দেশে এবং সমুদ্রতীর-বাসীদের মাঝে প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের জাহাজের কাছে এমন অনেক নৌকা আসত যাতে শিশু পযন্ত দেখতে পেয়েছি। শিশুর মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা কবেছি এবং জেনেছি তাদের বাড়ি আছে। শিশুদের বাড়িতে দেখাব মত লোক নাই বলেই নৌকাতে সংগে আনতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে অনেক কথা অমুসন্ধান না কবেই লিখে ফেলেন এবং সে অপ্রকৃত সংবাদ স্থবির লেখকগণ সংগ্রহ করে জন সমাজে প্রচার করে। অবশ্য চীন দেশে ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করাটাও একটু কষ্টকর।

চীনাবা নিদেশী লোকের সঙ্গে বিদেশী ভাষাতেই কথা বলতে ভালবাসে। বিদেশীর কাছে যখন তাদের নিজের ভাষা শুনে পায় তখন তারা সে কথার জবাব না দিয়ে মুখ ফিবিযে বাখে। আমিও সামান্য কয়েকটি চীনা শব্দ জানতাম। ভুলেও আমি তা উচ্চারণ করিনি। একদিন সাম্পানে একটি চীনা শিশুকে দেখতে পাই এবং জাহাজ থেকে নেমে একখানা সামপান ভাড়া করে শহরের দিকে রওয়ানা হই। শহরে যাবার কোন ইচ্ছা ছিল না, তবুও গিয়েছিলাম শুধু সাম্পানের মাঝিকে বেশী পরসাদেবার জন্য। কিনারায় পৌঁছে, কিনারা হতেই কয়েকটি শুকনা ফুল একটি দোকান থেকে কিনে নিয়ে চলে এলাম এবং যে নৌকাতে শিশু দেখেছিলাম সে দিকে সামান্য চান্দ্রিতে ফলসার। সাম্পানের নিকটে পৌঁছে আমি একবারো জিজ্ঞাসা করে কেহিনি যে তাদের বাড়ি ঘর আছে কিনা। যে নৌকাতে শিশু

ভবঘুরের ঝিলাত খাজা

ছিল সেই নৌকা ভাড়া করার দরকার বলে দর করে থাকি। দর করার সময় এমনি ভাবে ভাড়া করতে লাগলাম, যাতে করে জীলোকটি বিরক্ত হয়। জীলোকটি বিরক্ত হয়ে বলল এটা ঘর নয়, এটা সামপান আমি তৎক্ষণাৎ বললাম তোমার কি ঘর আছে, যে ঘরের কথা চিন্তা করতে পার? যাদের ঘর আছে তারাই সংবাদ রাখে। তোমরা জন্মেছ সমুদ্রে, মরবেও সমুদ্রে।

জীলোকটি আর ঠিক থাকতে পারল না। সে প্রথমেই আমার চৌদ্ধ-পুরুষকে উদ্ধার করল তারপর বলল “আমার বাড়ি-ঘর সবই আছে।” জীলোকটি যখন বলেছিল তার বাড়ি-ঘর সবই আছে তখন তার চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছিল। আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি নি।

চীন-দেশে গরীবদের বড়ই দুর্দশা। জীলোকদের প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। যারা জী-চরিত্র নিয়ে বই লেখেন তাঁরা এদিকে একটু মন দেবেন। আমি এখানে নীরব থাকব। চীনা জীলোক নানা কারণে নিজের ঘর থেকে অনেক দূরে থাকতে ভালবাসে। অত্যাচারী চীনা জমিদারের অত্যাচার চীনারা সর্বদা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকে কিন্তু তাদের জীলোকের প্রতি যখন জমিদারের দৃষ্টি পড়ে তখনই তারা বন জংগলে পালায়, নদী কাছে থাকলে সামপানে আশ্রয় নেয়। বিদেশী পর্যটক তজ্জটুকু সংবাদ নেবার দরকার মনে করেন না। যা মনে আসে তাই লিখে স্থগী হন। চীনাদের হয়ে প্রতিবাদ করারও কেউ নাই। যারা প্রতিবাদ করার শৌক তারাই অত্যাচারী। ভবিষ্যতে কিংবা চীনের নদীতে অথবা সাগরে বিদেশি রেণায় কেউ এসে সামপানে থাকবে না। চীনারা সামাজিক উন্নতি বেশ আড়ালিভাঙি করে কেলছে।

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

আমাদের জাহাজের মাল নামিয়ে কের মাল বোকাই হ'ল। এবার আমরা বাব সাংহাই। সাংহাই দেখতে পাব ভেবে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমি জাহাজের নাবিকদের কাছে সাংহাইএর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। সাংহাইএর কথা শুনে কেউ সাড়াও দিল না যদিও বা কেউ কিছু বলল তা-ও মামুলী কথা। সমুদ্রে যারা বেশী দিন কাজ করে তাদের অন্তর শুকিয়ে যায়। তাদের বাসনার তৃপ্তি হয় না। তারা হয় একেবারে এক নম্বর লোভী। লোভী হলে কি হয়, লোভের ত'তৃপ্তি হয় না। তাদের বাসনা শুধু বেড়েই যায়। যাদের বাসনা বাড়ে তারা কথা খুব কম বলে।

জাহাজ ছাড়ল। আমরা আবার বাহির সমুদ্রে আসলাম। এবার প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ আমাদের জাহাজকে কাঁপিয়ে তুলল। জাহাজখানা তৃণের মত ভেসে চলল। দু-দিনের মধ্যে তিনবার বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠলো। বিপদ ঘটল না। আমরা বেঁচে গেলাম। ইচ্ছা ছিল কি করে বিপদ আসে তাই বলি, কিন্তু আমার তা বলায় ক্ষমতা নাই। তৃতীয় দিন আকাশ পরিষ্কার হল। সমুদ্রতীর দেখা যেতে লাগল। নানা রকমের পাখী আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল। আমার কাছে পথের সুখ বেশ ভালই লাগল।

অষ্টম দিন সকাল বেলা আমাদের জাহাজ ইয়াংসী নদীর মোহানায় আসল। ইয়াংসী নদীর মোহানা আর গংগা নদীর মোহানা একই রকমের। তবে গংগার মোহানায় জাহাজ যাওয়া-আসা অতি কম আর ইয়াংসীর মোহানায় জাহাজের যাওয়া-আসা এত বেশী যে পূর্বদিকে সাংহাই-এর মত দ্বিতীয় বন্দর আর একটিও নাই। যখন কোন বন্দর জাহাজ পৌঁছায় তখন কত লোক কত বাসনা মনে পোষণ করে তার সংখ্যা নাই। প্রত্যেকটি বাসনার সিক্তে রয়েছে

ভবঘুরের বিলাত বাজা

সুখ। অনেকে আত্মীয় দেখবে মনে করে বন্দরে পৌঁছে। যখন আত্মীয়ের দর্শন তারা পায় না তখন তাদের মন ভেংগে যায়। বন্দরে আসা অনর্থক ভাবে। সাংহাই বন্দরে কত লোক কত বাসনা নিয়ে আসছে কে জানে? কিন্তু কজন্যর মনের বাসনা পূরণ হবে তাই হল ভাবার কথা।

জাহাজে পাইলট উঠেছিল। আমি ভাবছিলাম পাইলট সোজা ভাবেই জাহাজের গতি বেখে চালিয়ে যাবে। কিন্তু তা করল না। আঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আমাদের ছোট জাহাজটাকে চালাতে লাগল। নদী গভীর না থাকার জন্তই সেরূপ করতে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের জাহাজ ক্রমেই আগিয়ে গিয়ে সাংহাই নদীতে পড়ল। এবার জাহাজের ছড়াছড়ি। নদীর জল প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে। জাহাজ বেশ সোজা ভাবেই চলতে লাগল। মালবাহী জাহাজগুলি একটু দূরেই থাকে। সেজন্ত সাংহাই নদীতে প্রবেশ করেই নিকটস্থ একটি ডকে আমাদের জাহাজকে ভেড়ানো হল। ব্রীজ হতে এবং নীচ হতেও সিঁড়ি ফেলে দেবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছিল। চীনা কুলিদের বিলম্ব সত্ত্বেও হচ্ছিল না, এমন কি বারা কিছু বিক্রি করতে তাঁরে দাঁড়িয়েছিল তারাও কতক্ণে জাহাজে এসে উঠবে সেজন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করছিল। সিঁড়ি ফেলা হয়ে গেলে পংগপালের মত কতকগুলি লোক জাহাজে উঠলো। অফিসারগণ, বয়, খালানী কেউ কেব্রীওয়ালাদের কাছ হতে কিছুই কিনল না। কেব্রীওয়ালারা মনে যখন কিরে বাজছিল তখন আমি একটি লোককে জিজ্ঞাস্য করলাম “কি নিয়ে এসেছ?” লোকটি দাঁত বের করে হাসল, তারপর কতক্ণে তার কাছে নানারূপ ছবি আছে। তার কাছে যে লোকসমূহ ছিল তা প্রকাশ্যে স্থানে দেখাবার উপায় নাই। বুঝতে পারলাম না

ভবঘুরের বিলাস বাজী

ছবিগুলি কি হতে পারে। তারপর শুধু ছবি নয়, সে ধন্যদের অনেক কিছুই আমাকে দেখাতে লাগল। প্রত্যেকটি আমি পরিত্যাগ করে ফেরিওয়ালাকে বললাম, বয় এবং পাঁচকদের মাঝে গৃহস্থ-ঘরের ছেলেও আছে। সাংহাইএ এমন কিছু কি নাই যা দেখে বিস্ময় আনন্দ পাওয়া যায়? ফেরিওয়ালার ধারণাও করতে পারল না বিস্ময় আনন্দ কাকে বলে। আমি তাকে আর না ঘাঁটিয়ে বিদায় দেবার পূর্বে ভারতীয় ছোট একটি সিকি বকশিস্ দিলাম। সে সিকিটি পেয়ে বার বার আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। স্ত্রের বিষয় পুনরায় সে তার প্রস্তাবিত বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করল না।

আজ হতে নামবাব পূর্বে প্রত্যেকটি কেবিন বন্ধ করা হয়েছে কি-না তা' পরীক্ষা করে এলাম। যে পথ ধরে আমি চলাছিলাম তার দুদিকের ঘরগুলি কোনটি এক তলা, কোনটি দোতলা। পথটা পিচ্ছিল এবং কর্দমাক্ত। সারি দিখে রিকশা চলাকেরা করছে। দু'এক খানা ট্যাক্সি বাজী নিয়ে তাড়াতাড়ি চলছে। ফুটপাথে নানা রকমের লোক নানা রকম কাপড় পরে আপন মনে আপন গন্তব্যস্থলে চলেছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে শিশু, বৃদ্ধ এমন কি সুবকও দাঁড়িয়ে আছে। তারা কেউ "আমাকে কিছু দাও" বলল না, এমন কি হাতও পাতল না। তবে তারা ভিকার উপরই নির্ভর করে তা বেশ বোঝা যায়। শিশুরা কাজ করতে পারে না, বৃদ্ধ অকেজো। এক সুবকের কর্মশক্তি ছিল কিন্তু অনেক দিনের বাজাতাবে তারাও অকেজো হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি লোকের প্রতি বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখলাম এরা যেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসেছে। এরা পণ্ডিত, ব্রাহ্ম, শঙ্কর, হুবা পেনে বাব্বারের অবৈধন কল্যাণ এদের সে চিন্তাও নেই। এদের এমন ছিল কেন তা কিছু জানি না।

ভবঘুরের বিলাত বাজা

করতে সাহস হ'ল না, কি জানি কি চেয়ে বসে। এই জেপীর লোক অনেক ডাইনে এবং বাঁয়ে বেধে চাপাই এলাকা পেরিয়ে আমি ইন্টার-স্টাসনেল এলাকায পৌঁছলাম। এখানেও পথের দু'পাশে সেরকম লোক দেখলাম বটে তবে অল্পপাতে তাদের সংখ্যা খুবই কম।

ইন্টার স্টাসনেল এলাকায় নানাকিন রোড প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বিদেশীরা নানারূপ দৃশ্য দেখতে আসে। আমি তাই দেখতে এসেছি। আমারও পা এগিয়ে চলেছে। আমিও দু'দিকে দৃষ্টাবলী দেখে চলেছি। কিন্তু আমি যেন কিছুই দেখছি না বলে মনে হচ্ছিল। পথটির দু'পাশে নানা রকমের বিল্ডিং। নানাকিন রোডের সবচেয়ে উচু বিল্ডিং বোধ হয় পনেরো তলা হবে। তবে কলকাতার মত পথের পাশেই কোথাও বস্তি নাই, এমন কি চীনা টাউনেও এক থানা বস্তি দেখতে পাইনি। বড় বড় বাড়িতে নানা রকমের হোটেল, কোনটাতে খাবারের দোকান আর কোনটাতে দরকারী বস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিস স্তরে স্তরে সাজানো। অনেকগুলি দোকানের দরজার পাশে সাজানো জিনিসও দেখলাম কিন্তু কোথাও আমার মন যেন ঝাপ খেতে চাইল না। শেষটায় একটা রেষ্টুরায় গিয়ে উঠলাম। একটি চেয়ারে বসে মাত্র বয়রা দৌড়ে এসে আমি কি চাইব বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল। মামুলী খাবার আনতে আদেশ দিয়ে অন্যান্য আগন্তুকরা কি রকম এবং কোন দেশের কোন কোন জাতের লোক দেখতে লাগলাম। পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকই সেখানে ছিল। কেউবা আনমনে তাকিয়ে আছে, কেউবা মনোমগ্ন হয়ে আছে আর কেউবা সেনদিনের সংবাদ নিয়ে বেশ দীর্ঘ দীর্ঘ হাসি করছে। এখানে সবাই মজা করে। তবে মনে হ'ল এখানে খাবারের দোকানের প্রত্যেকেরই পকেটে কিছু আছে। মনিরওয়ান দাঁড়িয়ে

ভবঘুরের বিলাস যাত্রা

ভক্তলোক হুগুরা যায় না। পথের পাশে যে সকল নরপঙ্ক্তকে দেখে এলাম তারা মানুষ, কিন্তু তারা জড়-পদার্থ হয়ে গেছে। কেন তারা প্রত্যেকেই জড়-ভরত হ'ল সে কথার উত্তরে এদের অর্থাভাবেই একমাত্র কারণ সে কথা সকলেই বলবে। অতএব অর্থই হল ভক্ত এবং অতন্ত্র হবার মাপকাঠি। একদিন এমনও ছিল যে, যারা রাজা এবং মহারাজা তাদের ঘরেই টাকা পয়সা থাকত। এখন টাকা-পয়সার সীমা বেড়েছে সেইজন্য এই জড়ভরতদের পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

নানকিন রোড হতে ফিরে আসবার পথে একটা কদম্ব দৃশ্য দেখে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম এবং তথাকথিত ভক্ততার সীমা লংঘন করে আবোল তাবোল বকতে লাগলাম। জানি না' কবে বৃষ্টি হয়েছিল কি বরষা পড়েছিল। পথে কিন্তু কাদার মতই কি দেখতে পাচ্ছিলাম। কাদার পাশেই একটা লোক মাটিতে বসে তার কামিজ হ'তে উকুন বের করে তাই খাচ্ছিল। সর্বপ্রথম লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম এমন করছিস কেন? সে আমার কথার জবাব দিল না। তারপর পথচারীদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম-একে কি কেউ সাহায্য করছে পারে না। এক্ষণ দৃষ্ট রাজপথে কি দেখানো উচিত? এতে কি সাক্ষ্য সত্যতার অবমাননা হয় না। আমার কথার কেউ জবাব দিল না। অনেকে হয়ত ভেবেছিল আমিও এই নরপঙ্ক্তটার মতই কিছু হব। শেখটার আর সন্ধান করতে পেরে নরপঙ্ক্তটাকে উঠানোর এবং আমার সংস্পর্শে আসতে বললাম। কিন্তু তার উঠবার ক্ষমতা ছিল না। উপারান্তর না দেখে লোকটার পাশে দুটি টাকা রেখে জাহাজে চলে এলাম। সাংহাই দেখার জন্য আর শহরে বাই নি। হকারে প্রত্যহ দৈনিক জাহাজে জাহাজে দিয়ে যেত তাই মন দিয়ে পড়তাম আর নৃত্য করতাম। সাংহাই-এ দেখার মত আমার কাছে কিছুই ছিল না।

ভবদুরের বিলাত সাধা

সাতটি দিন আমাকে জাহাজে কাটাতে হয়েছিল। শরীর বাতাস ঘেন আমার ভাল লাগছিল না, শরীর ক্রমেই দুর্বলবোধ হচ্ছিল। কখন জাহাজ বন্দর হতে বিদায় নেবে তাই বাব বার ভাবছিলাম। অষ্টম দিন সকাল বেলা জাহাজ বন্দর হতে নোঙর উঠাল, আমিও ইপ ছেড়ে বাঁচলাম।

এবার আমবা জাপান যাব।

বেলা তিনটার সময় আবার আমবা চীন সাগরে এসাম
অফিসারদের খাবার দিবে তানব কেবিন ভাল করে পরিষ্কার করলাম।
পাইখানাগুলি পরিষ্কার আছে কি না তা ভাল করে দেখলাম তারপর
ডকে গিয়ে আমারই রক্ষিত একখানা ইজি চেয়ারে বসে একবার
আকাশের দিকে আর অগ্ন্যবর চারিদিকের সাগরের দিকে দেখতে
লাগলাম। বয়, পাচক অথবা বালাসী এমন করে বসে থাকতে ভাল
বাসত না। তারা কাজ করার পরই নিজেদের কেবিনে বসে কে কি
করল এবং পরবর্তী বন্দরে গিয়ে কি করবে তাই নিয়ে কথা বলে।
এদের কথাই রকম দেখে আমি দুঃখিত হতাম এবং যাতে এদের
উন্নতি হয় তারই চেষ্টা করতাম। এরা কিন্তু আমার কথা শুনত না।
আমি ছিলাম মুসলমান। নতুন মুসলমানের কথা পুরাতন মুসলমানরা
শুনতে চায় না। এদের আমার প্রতি অনহেলা দেখে আমি মনে মনে
ইঁদুরতাম, মুখে কিছুই বলতাম না।

পরের দিন থেকে শুধু ঘোলাটে সমুদ্র আর নীল আকাশ। ঘোলাটে জল কমেই নীল জলে পরিণত হতে লাগল। পিঠের সামরীক গভীর বর বলেই ঘোলা জলে এবং নীল জলে যখন নিপতে আরও বর এবং দাঁত প্রতিধাতে চক্কর, ঘুরে নীতির নিকে কালের চক্কর।

ভবঘুরের বিলাত বাজা

বায় তখন দেখতে বেশ আরাম লাগে। আমি এ সবই বলে ফেঁকতাম
 আর ভাবতাম এবার জাপানটা একটু দেখতে পারলেই ভাল হবে। চার
 পাঁচ দিন একরূপ ছোট-বাটো দৃশ্য দেখেই কাটিয়ে দিলাম তারপর যেন
 হল সাগর যেন ক্রমেই গভীর হচ্ছে। সমুদ্র তীরে যে সকল পাখী বাস
 করে তাদের গমনাগমন লোপ হয়ে যাচ্ছে। কুচিং দু একখানা
 জাপানগামী অথবা জাপান হতে অন্তর্জ কোথাও যাচ্ছে এমনই ধরনের
 জাহাজের সংগে দেখা হতে লাগল। এরূপ ভাবে আরও চার পাঁচ
 দিন কেটে গেল। তারপর প্রায়ই জাপানী মাছ ধরার মোটর বোট
 গুলির সংগে দেখা হতে লাগল। মোটর বোটগুলির জেলেদের যেন
 জীবন নাই। তারাও আমাদের দেশের বকের মত মাছের দিকেই
 তাকিয়ে রয়েছিল। তাদের পাশ দিয়ে একটা জাহাজ চলে যাচ্ছে
 সে দিকে তাদের জ্ঞপ্তি নাই। আমাদের জাহাজ একখানা জাপানী
 জেলে-বোটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। কয়েকজন লোক তাতে ছিল
 এমন কি একটি যুবতীও মাথায় লাল শালু কাপড় বেঁধে কি এক প্রকার
 প্রান্তির আশায় জলের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি সেই যুবতীকে
 পন্টনী কায়দায় নমস্কার জানালাম। যুবতী আমার দিকে তাকালও
 না। এতে আমি হুঃখিত হলাম না। জুওয়া আর পাওয়া নিয়ে
 সংসার। যুবতী মাছের দিকে চেয়ে রয়েছিল। আমার রূপও ছিলনা,
 দেবার মত টাকাও ছিল না। যুবতী আমার দিকে চাইবে কেন? তবে
 যুবতী, হুন্দরী, যুবকগুলি হুপুফু, আর যে সকল প্রৌঢ় বসে রয়েছিল
 তাদের পালের মোটা হাড়ের উপর মাংসের অভাবে, তারা যে খাট
 ব্রাউন সোংগোলিয়ান তাই বোঝা যাচ্ছিল। ব্রাউন সোংগোলিয়ানদের
 বেশ হুন্দর দেখায়। যেই তাদের প্রৌঢ় এল অরনি যেন তাদের
 হুন্দর হুং এবং গঠন বদলে দিয়ে অস্ত্র করে বায়।

ভবঘুরের বিলাত খাতা

দিনটি দেখতে দেখতেই কেটে গেল। দিনে বয়রা আপানের খেঁইসা বালিকা, আপানের বারবনিতালয় এসব কথা নিয়েই বেশ আলোচনা করতে লাগল। আমি তাদের কথা কান দিয়ে শুনতে লাগলাম, এবং ভাবতে লাগলাম হয়ত বয়রা আপানের এর বেশী কিছুই দেখে না, হয়ত আমি এর বেশীও কিছু দেখব।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উত্তর দিক হ'তে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। আমাদের জাহাজ মন্থর গতিতে চলেছে। পাইলটের জন্ত সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাইলট একখানা বড় স্ট্রিম বোট নিয়ে প্রবল গতিতে আমাদের জাহাজের দিকে আসছে। অদূরে কতকগুলি আপানী জেলে মোটর-লঞ্চার সাহায্যে মাছ ধরছে। আমাদের জাহাজ যেন তাদের জালের উপর না গিয়ে পড়ে সে জন্ত জেলেরা বাতির সাহায্যে সিগ্‌নেল দিচ্ছে। বাতিগুলি লাল। দূর থেকে হাপরের চোখের মতই দেখাচ্ছে। পাইলট জাহাজে এসে উঠল। জাহাজের গতির পরিবর্তন হল, জাহাজ বন্দরের ভিতরে প্রবেশ করতে লাগল। বন্দরের নাম সিমনোসেকী। জাহাজ ডকে ভিড়ল না। দূরে নোঙর ফেলল। কতকগুলি আপানী ম্যনি-চেন্‌জার এসে জাহাজে উঠল। তারা প্রত্যেকে আপানী ম্যনি বাচাই করল। প্রত্যেকেই আপানী টাকা কিনল। আপানী টাকার নাম হচ্ছে ইয়েন্। আর পরসার নাম হল কেন। আমি পাঁচটি মাত্র ইয়েন্ কিনলাম। এতে আপানী কৌকটি আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। তারপর বলল—এতে কৌক-হাউস দেখা হবে না, আরও ইয়েন্ কিনুন। আপানীকে বললাম আমি কৌক-হাউসে যাবনা বলেই কম ইয়েন্ কিনেছি। বয়দের কাছে কৌক-হাউসের কথা শুনেছিলাম। এসব কথা পাঠককে উপহার না দেওয়া ভাল।

জব্বুরের বিলাস বাজা

অকিসাররা একখানা মোটর বোটে বোকাই হয়ে শহরে চলে গেল।
পরের ট্রিপে কয়েকজন বয় এবং খালসীও তীরে গেল। আমি
জাহাজেই রইলাম। খাবার খেয়ে নিরিবিলিতে ডকের উপর বসে
সিমনোসেকীর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। অদূরে কে বসে বাঁশের বাঁশী
বাজিয়ে জাপানী গান গাইছিল। জাপানী গান শুনতে মধুর নয়, তবে
তাদের বাঁশী বাজানোটা আমাদের দেশের চেয়েও ভাল লাগল। আমি
সেই বাঁশী শুনেই কেবিনে এসে শুয়েছিলাম। বেশ ঘুম হ'ল।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে ফের ডেকে গিয়ে সিমনোসেকীর আসল
রূপ দেখলাম। পাহাড়ের পায়ে ক্রমেই কাঠের ঘরগুলি চেউ খেলে
আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। ছোট ছোট অলিগলি পথগুলি
দোড়ে এসে যেন ডকের সংগে মিলেছে। হু একখানা মোটরকার
দেখতে পেয়ে ভাবলাম, জাপান শুধু খেলনা বাসাতেই শিখেছে—এখন ও
জাপানকে ফোর্ডের উপরই নির্ভর করতে হয়। তীরে গিয়েও দেখলাম
কোর্ড কোম্পানীর মোটরগুলিই চলা করা করছে। সমুদ্র তীর হতে
যে সকল স্বল্প-দীর্ঘ মোটা পথগুলি শহরের দিকে চলেছে তার হু পাশেই
নানা রকমের চায়ের দোকান, কাঁচের দোকান, খাবারের দোকান
রয়েছে। এক দিকে এক পাশে একটি রিক্সারও আড্ডা। রিক্সা
গুলি দেখলেই মনে হয় চীনের কথা কিন্তু লোকগুলিকে দেখলে সেরূপ
কিছুই মনে হয় না। এদের পৌবাকও একটু আশ্চর্য ধরণের। তাদের
পাদে যে ধরণের জুতা দেখলাম তা পৃথিবীর আর কোন্ ব্যবহার করে না
শুধু জাপানেই দেখা যায়। রিক্সার বসার আমার দরকার ছিল না
তবুও যখন একটা রিক্সা-পুলার আমাকে ডাকল, আমি তার ডাক
অনুসরণ না করে তারই কাছে গেলাম, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল.....
.....তাই নাকি ?

তবঘুরের বিলাত যাত্রা

না।

তবে যাবে কোথায় ?

শহর দেখতে।

রিকশায় বসবে ?

না।

আমি আব তার কাছে দাঁড়ালাম না। আমার পোষাক আর আমার কাজের প্রতি বেশ ঘৃণা হ'ল। বেখানেই যাচ্ছি সকলেই আমাকে শুধু বদ-কথা জানাবার জন্যই চেষ্টা করছে। বয়, খালসী আঙুনওয়ালা, মামুলী অফিসার এরা যেন ভাল কথা চিন্তাই করতে পারে না। এরা যেন শহরে পৌঁছা যাত্রাই মদের দোকান কোথায় আছে তা আর চায় কান্দী। পথ দিয়ে বখন মাথা নিচু করে চলছিলাম তখন ভাবছিলাম হরত যারা সর্বপ্রথম আমাদের কাজ করেছে তারা এসব বিষয় নিয়েই থাকত বেশী এবং সেজন্তাই সমগ্রীর লোক দেখলেই সাধারণ লোক ভাবে। এরা শুধু দ্রুতিত আবাদ চায়, পারত তাদের ইচ্ছিত জিনিষ দেখিয়ে দেও নতুবা এদের সংপ পরিচয় কর। নাবিক জীবনটার প্রতি আমার বেশ ঘৃণা হ'ল। সিননোসেকীতে আসার পর যারাই আমার সংপে কথা বলল তারাি আমাকে কুশানের আবাদই দিতে লাগল। জাহাজে যে সকল লোক কাজ করে তারা খেদ ক্ষতি করতে পারেন না।

পারিসের গায়ের শহর সাধারণতই পরিষ্কার থাকে, 'নেকক' এ শহরখানাও বেশ পরিষ্কার। ছোট গলিপথগুলিতেও বতটুকু পল্লব ততটুকুতে পিচ দেওয়া হয়েছে, তার পরই সিঁড়ি দেওয়া পথ। পারিস শহরের ভেতরে 'পেলাস' নাম। বতটুকু দেখার উপায় তাই 'পেলাস' নাম।

ভবযুগের বিশাত বাত্রা

এলাম। আমরা মনে শুধু একই কথা আশাত করতে লাগলাম, কেন পৃথিবীর লোক নাবিক শ্রেণীকে এত ঘৃণা করে?

বেলা দশটার জাহাজ মোজী বলে একটি ছোট নগরে একটু দাঁড়াল এবং কতকটা কয়লা উঠাল। জাহাজের জাহাজে বারা কয়লা উঠিয়ে দিল তারা ছিল জীলোক মজুর। জীলোক মজুর সাধারণতঃ ডকে দেখা যায় না, তাই জীলোক মজুর কি করে শরীর খাটিয়ে ডকে কাজ করে তাই লক্ষ্য করতে লাগলাম। আচার এবং নিষ্ঠা বলে যদি কিছু থাকে তবে তার চান্দ্র অতুল্য হয় জীলোকদের মাঝে। এক একটি খুড়ি কয়লা ডক হতে উঠিয়ে একটি নারী অথ নারীর হাতে দিচ্ছিল আর সেই কয়লা আমাদের জাহাজের বাংকে পৌঁছে বাচ্ছিল। একটি কয়লার টুকরাও মাটিতে পড়ছিল না। পুরুষ লোক যদি এই কাজটি করত তবে অনেক কয়লা তারা ইতস্তত নিক্ষেপ করত এটা নিশ্চয় কথা। জীলোকের কয়লা উঠানো ছাড়া মোজীতে আর কিছুই দেখতে পেলাম না, জাহাজ ছেড়ে দিল এবং বেশ মন্থর গতিতে চলে তৃতীয় দিন কোবিতে এলে উপস্থিত হল। এবার আমরা তিন দিন ছুটি পাব। ভাবলাম নাবিক শুধু অপকর্মই করে। কারো কাছে কোন ভাল কথা জিজ্ঞাসা করলেও উন্টা বুকে এবং খারাপ পথই দেখিয়ে দেয়। নাবিক বেশে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমার দিকে কেউ স্নদৃষ্টিতে চাইবে না। এখন থেকে বোবার মত পথে হাঁটব এবং শুধু দেখতেই চেষ্টা করব। এর বেশী আশা করার কিছুই থাকবে না।

কোবিতে কতগুলি লোক রিকসা টানে। এদের হাব-ভাব এবং ভাষা-চলন দেখে সাধারণ লোক বলে মনে হল না। তারা বিশেষ লোক এবং ছন্দেবন্দে থাকে তাদের কাজে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

হয়। তাই একটি রিকসা ভাড়া করতে গেলাম। রিকসা-পুলার আমাকে দেখেই বলে বসল “এখনও সময় হয়নি। এবে মাত্র দশটা বেজেছে, বারবণিতারা এখনও শুয়ে আছে।” আমি রিকসা-পুলারকে বললাম “আমাকে একটা খাবারের দোকানে নিয়ে চল খাবার বোধ হয় এখন পাওয়া যাবে?” “সহস্র ধন্যবাদ মহাশয়, চলুন খাবারের দোকানে নিয়ে যাচ্ছি।” রিকসা-পুলাররা সাধারণত ভ্রমালোকের সংগে কোনরূপ দরদস্তুর করে না। কিন্তু আমার শরীরে জাহাজী পোষাক থাকার জন্যই রিকসা জানিয়ে দিল, খাবারের দোকানে খাবার ভাড়া দুই ইয়েন লাগবে। আমি তাতেই রাজি হলাম। চীনা রিকসাতে দুজনও বসা যায়। জাপানী রিকসাতে একজনের বেশী বসতে পারা যায় না। রিকসার সিটের পিছনে ইংলিশে তাই লেখা ছিল। পথ দিয়ে খাবার বেলা এই বিজ্ঞাপনটুকু আমার দৃষ্টিপথে এসেছিল। পথের দুদিকেও চেয়ে দেখছিলাম। শুধু কাঠের ঘর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকে বলে জাপানে পিস-বোর্ডেরও ঘর আছে, আমি কিন্তু পিসবোর্ডের একখানটা ঘরও দেখতে পেলাম না। দেখতে দেখতে সময় চলে যাচ্ছিল। আররা একটি জাপানী খাবারের দোকানের সামনে এলাম। খাবার ঘরে পৌঁছে দেখি ইউরোপীয় খাদ্য জাপানীরা বলে খাচ্ছে। আমি হলাম জাহাজের বয়। ইউরোপীয় খাদ্য রোজই আমি খাই। জাপানী খাবার চেখে দেখতে এসে এলাম ইউরোপীয় খাদ্যের বেঞ্চেয়ার। রিকসা হতে নেমে জাপানী রিকসা-পুলারকে তার পাওনা দুই ইয়েন দিয়ে বিদায় করেছিলাম। কথা বলার আর লোক পাও কি না তাই ভাবছিলাম, এমনি সময় হোটেলের একটি ঘর এসে আমাকে বলল “মাননীয় মহাশয়, আপনাকে কোন রাত্রে কি সাহায্য করতে পারি।”

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

আমি বললাম “আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন, আমি এসেছিলাম জাপানী খাবার খেতে; রিকসা চালক আমাকে পৌঁছিয়েছে আপনাদের এখানে, আমি একটি জাপানী খাবারের দোকানে যেতে চাই। দয়া করে যদি একটি জাপানী খাবারের দোকান দেখিয়ে দেন তবে বড়ই বাধিত হব।” জাপানী বয় আমাকে পাশেরই একটি দোকানে নিয়ে গিয়ে দোকানের মালিককে জাপানী ভাষায় কি বলে দিল তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, “এই সম্মানিত ভদ্রলোক আপনার কাছে জাপানী খাদ্য বিক্রয় করবেন তার বন্দোবস্ত আমি করেছি, এখন আমি যাই, বিদায় সুসম্মানিত ভদ্র মহাশয়।”

লম্বা একটা কাঠের ঘর। কাঠের মেজেটা এতই পরিষ্কার এবং মসৃণ যে পায়ে মোজা থাকার ভয়ই পিছলিয়ে পড়িনি। বাইরে ছুটা খুলে ঘরের ভেতর গিয়ে মেজের উপরই আসন করে বসলাম। কি খাওয়া হবে জানতে পারলাম না, ঘরটার আশে পাশে প্রবন্ধ তাক করে তাকিয়ে দেখলাম। ঘর খানা বেশ পরিষ্কার। ঘরের এক কোণে দু'জন জাপানী থাকছিল তাদের পাশে বসে একজন মহিলা কি ভেঁকে উঠতদের পাতে দিচ্ছিলেন এবং তারা দুটি কাটির সাহায্যে তাই খুঁবে দিচ্ছিল। কতক্ষণ পর অল্প আর একজন মহিলা ‘আমার’ কাছে কতকগুলি খাদ্য এনে রাখলেন এবং ততক্ষণ চলে গেলেন। কতক্ষণ পর সেই মহিলাই পুনরায় একটা উত্তর এবং কতকগুলি চালের গুঁড়ি নিয়ে আমার কাছে বসলেন এবং আমাকে খাওয়া দিয়ে “প্রণাম” করলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বেশ হাসি মুখে খাবারের থালাটা এক খানা জলচৌকির উপর রেখে দিলেন যেতে ইংগিত করলেন। বড় থালাতে কোরান্দা, সুদা

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

সিদ্ধ, লাউপাতা সিদ্ধ, ছোট ছোট মাছ ভাজা এবং এক পাশে ভাতও ছিল। জাপানী প্রধায় একটা বড় কাপে কিছুটা ভাত নিয়ে তাই মূল্যসিদ্ধ দিয়ে কিছুটা খেলাম। তারপর মাছভাজা হাত দিয়ে উঠাতে যাচ্ছি এমন সময় জ্বীলোকটি ছি, ছি, বলে অক্ষুট চীৎকার করে উঠলো। আমি কিন্তু ছোট মাছ-ভাজাগুলিকে দু'খানা কাঠির সাহায্যে উঠিয়ে মুখে দিতে পারছিলাম না। অবশেষে জাপানী জ্বীলোকটি দুটি ছোট মাছ আমার মুখে দিয়ে দিল। মাছভাজা অথবা মূল্য সিদ্ধতে নুন না থাকায় জাপানী খাদ্য আমার কাছে অখাদ্যে পরিণত হয়েছিল। আমি আর খেলাম না। ইংগিতে চালের গুঁড়ি পাক করতে বললাম। জ্বীলোকটি গুঁড়িতে জল ঢেলে দিয়ে দু'খানা কন্ডুর সাহায্যে একটু নাড়ল তারপর তাই একখানা মাটির প্লেটে ঢেলে দিয়ে আগুনের উপর রেখে দিল। কতক্ষণ পর তাই একখানা পিঠার পরিণত হল। সেরূপ পিঠা দেশেও খেয়েছি। তবে সেরূপ পিঠার সংগে যে কোন রকমের একটু মিষ্টির সংযোগ না হলে অখাদ্যই হয়ে যায়। চিনি অথবা গুড়কে কি বলে জানতাম না বলেই তাঁ' আর চাওয়া হল না, সামান্য একটু পিঠা খেয়েই উঠতে বাধ্য হলাম। এই সামান্য খাবারের দাম স্ব-ইচ্ছার দ্বারা ইয়েন দিয়েছিলাম। আমাকেই হরত জিজ্ঞাসা করবেন কিছু না খেয়েই ছ-ইয়েন মানে আড়াই টাকা দিতে হ'ল, সে কেমন কথা! এসব কথার উত্তরে বলছি “মিষ্টি হালিসিও একটা পান আছে।” আমি মিষ্টি হালির দাম দিয়ে হাঁপ ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়লাম। প্রতিজ্ঞা করলাম আর কখনও জাপানী খাদ্য খেতে বাব না।

কথা বলে সবুহ বিপদে পড়তে হয়েছিল সেজন্য আর কখনও কখনও না টিক করলাম। এবার শুধু হাটব আর দেখব কোথায় কি হয়েছে।

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

বেলা হয়েছে, দলে দলে লোক সমুদ্রে স্থান করার জন্ত রওনা হয়েছে। আমি তাদের পিছন না নিয়ে যে দিকে কেউ যায়না সে দিকেই যেতে লাগলাম। যে পথটাতে চলছিলাম তাতে লোক কমই চলছিল। তোমরা হয়ত ভাববে এবার শুরু হল এডভেঞ্চার। এডভেঞ্চার আরম্ভ হ'ল না। আমি এসে পড়ছিলাম একটি বাদর নাচের ঘরে। অনেকগুলি লোক সে ঘরে বসে বাদর নাচ দেখছিল। আমিও পন্চাশ সেট্ দিয়ে একখানা টিকিট কিনলাম। আমাকে বেশ ভাল সিটে বসতে দেওয়া হল, কারণ পন্চাশ সেট্ হল সবচেয়ে দামী সিট।

বাদর নাচ শেষ হতে আধ ঘণ্টার বেশী ছিল না। তবুও আধ ঘণ্টার মাঝে বা দেখলাম তাতেই জাপানীদের বাহাদুরী আছে বলেই মনে হয়। প্রত্যেকটা বাদর নানারূপ আদেশ মত কাজ করে ব্যক্তি। আমাদের দেশের বাবা বাদর নাচায় তারা পথে ঘাটে বাদর নিয়ে চলা কেঁরা করে, জাপানে তা করবার উপায় নাই। বাদর নাচের ঘর আছে সেখানে গেলেই বাদর নাচ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বাদর খণ্ডর বাড়ী বাবার দুষ্ট সকলেই দেখেছে, জাপানেও বাদরকে খণ্ডর বাড়ী, পাঠান হয়, মাছ ধরান হয়, পথ বাট পরিষ্কার করান হয়, এরূপ অনেকগুলি বাদর নাচ দেখে যখন বের হয়ে এলাম তখন কেবলই মনে হতে লাগল সেই লোকটার কথা যে অনেককণ বসে বাদর নাচাল। তার মুখ চোখ কেশগুলি শুক, চোখের দুই অংশেই পাঙ্গলের মত, কথা বলার ভংগিও যেন অনেকটা বাদরের মতই হয়ে গিয়েছিল। আমি আর কিছুই না দেখে জাহাজে চলে এলাম। জাহাজে মিনিটাই অন্তর গেল। শরীরও ভাল ছিল না, তাই অনেককণ করেই থাকলাম।

ভবঘুরের বিলাত বাত্রা

সন্ধ্যার পর ঘুম থেকে উঠেই দেখি সাগরের তীরের বিজলী বাতিগুলি এমনি ভাবে আলো বিতরণ করছে বাতে করে মনে হল এমন আলোকিত সমুদ্রতীর আর কোথাও দেখিনি। তাড়াতাড়ি করে শহরের দিকে রওনা হলাম। বিজলী বাতির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। তারপরে আসলাম একটি পথের মধ্যস্থলে। দুদিকের বিজলী বাতির গরমে শরীর হ'তে ঠস্ ঠস্ কন্নে ঘাম বেরুতে লাগল। এরূপ অভ্যাগ্ন বিজলী বাতিতে বেশীক্ষণ থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। পথটা হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। কলের মাহুয, কলের বেলগাড়ী ছোট ছোট খালার উপর রাখা হয়েছিল। কলের পুতুলগুলি এমনি সুন্দর করে নাচতে লাগল, বাতে করে মনে হয় যেন লিলিপুট নাচছে। নানারূপ চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখে পথটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম কারণ আমার হাটে এতে যেন ক্রমাগতই আঘাত লাগছিল। বার একবার ক্ষয়রোগ এনে দেখা দেয় তার পক্ষে বেশী আরামের স্থানেও থাকতে ভাল লাগে না। ক্ষয়রোগ বোধ হয় কলকাতাতেই আয়ত্ত্ব করেছিল। সিংগাপুর, পোণাং, শ্রাম এসব স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার জন্য আমাকে কাবু করতে পারেনি, কিন্তু ঐ যে কয়দিন উলবাস করে ছিলাম তারই ফলে শরীর দুর্বল হয়েছিল, রোগের প্রকোপও বেড়েছিল।' জাহাজে আসার পরই শরীর ভালর দিকে চলছিল। কিন্তু এখনই বেশী কাজ করতাম তখনই যেন শরীরে অবসাদ আসত। আজও আমার শরীরে বেশ একটা অবসাদ আসছে তাই কিছুই ভাল লাগছিল না।

শহর পরিত্যাগ করে আবার সাগরতীরে গেলাম, জাপানী বিজলী হ'য়েই সাগর জলে শরীরটাকে ডুবিয়ে রাখলাম।

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

✽

শরীরে বেশ আরাম পেতে লাগলাম, কিন্তু একটা পুলিশ এসে কিচির মিচির করতে লাগল। তার পিস্তল হতে ছোটো গুলি বেড়িয়ে আকাশের দিকে গেল। আমি প্রমাদ খালাম। সাগর জল হতেও উলঙ্গ অবস্থায় উঠতে পারছিলাম না। এ জীবনে সজ্ঞানে আজিই আমি বিব্রত হয়েছি, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না এ বিপদে কি কীরে লক্ষ্য নিবারণ করি। অল্প একটা পুলিশ এসে আমার উপর টিপ বাতির আলো ফেলল। আমি ভলে ডুব দিলাম। তবু এরা গেলন না দেখে বিব্রত অবস্থাতেই জল থেকে উঠে পুলিশকে বললাম “ভয়ানক গরম লেগেছিল তাই একটু স্নান করছিলাম।” পুলিশ বলল তারা ভেবেছিল কোন সুবক তার প্রেমিকাকে না পেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে।” তিন জনে বেশ হাসলাম। আমাদের দেশে অনেক সুবক সুবতী বিফল মনোরথ হয়ে যেমন নিজকে মেরে ফেলে জাপানেও তা ঘটে। এদিক দিয়ে আমরা জাপানের সমকক্ষ জাতি। আমি বলবই। রাতে জাপানী সমুদ্রে কেউ স্নান করে না। যারা স্নান করতে যায় ধরে নিতে হবে সে আর কিরে ধাবে না। এড্‌ভেনচার এবং ধূলি আমার মোটেই ভাল লাগত না, সেজন্য একপ ঘাতে আর না ঘটে সে জন্ত মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত করে নিলাম। আহাজ কাছেই ছিল, তাড়াতাড়ি করে হেঁটে গিয়ে আহাজে উঠলাম এবং সমাগত জাপানী ব্যবসায়ীদের সংগে জিনিষ কেনার বাহানা করে নানারূপ কুথার ডেভার দিয়ে তাদের দেশের নানারূপ সংবাদ নিতে লাগলাম।

কোবিতে এলেই বুঝলাম আমার বেশ আরাম হয়েছে। যদি কখনও থাকতাম তবে হাসিরে পরিতাম, কাজ পরিচালনা করতাম। কোকে আমাকে এমনই ওমাত বাডে করে আমি জাড়াভাড়া মরে

ভবঘুরের বিলাত বাজা

বেতাম, এখানে তা নাই। এখানে আমার রোগের কথা আমিই শুধু জানতাম আর ভাবতাম লগুনের কথা। কখন লগুন যাবো এবং হাসপাতালে গিয়ে শোব। বিশ্রাম নেবার জন্য আর শহর দেখতে বেতাম না। শুধু তাই নয়, একটু মজা করবার জন্য শহরে গিয়ে শহরের লোকের মাঝে কোন রোগ ফেলাও এটাও বিচার্য বিষয় ছিল। আমাদের জাহাজ নাগোয়া, ইয়াকোহামা হয়ে আমেরিকার দিকে রওনা হল।

প্রশান্ত মহাসাগরের সৌন্দর্য আমি বলতে পারব না কারণ প্রশান্ত মহাসাগরের সৌন্দর্য বলার ভাষা আমার নাই। জাপানের কাছেই একটি গভীর সমুদ্র। গভীর সমুদ্র গাঢ় নীল হয়। তাতে তরংগ থাকে প্রচুর। আমাদের জাহাজখানা একটি শুকনা পাতার মত সাগরে ভেসে চলল। ক্রমাগত চলতে লাগলাম। চারিদিকে নীল সমুদ্র আর উপরে নীল আকাশ। গরম মোটেই নাই। উত্তরের বাতাস এসে আমার শরীরে লাগছিল আর শরীরটা নেচে উঠছিল। আমার শরীরের শক্তি ফিরে আসছিল। আমার ভাববার শক্তি বেড়ে চলছিল। আমি দেখছিলাম উর্ধ্ব আকাশে কতকগুলি পাখী আমাদের সংগেই যেন চলেছে। জানতাম এসব পাখী মণ্ডার পূর্ণতা পর্যন্ত চলতে পারে। সমুদ্র তীর তাদের কাছে অতি কাছে! তবুও তাদের দিকে চেয়ে থাকতাম। যখনই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত বাহু আকাশে উড়ত তখনই এই পাখীগুলি বাহুর উপর ঝাঁপিয়ে পরত। আমার কাছে ছরবীণ ছিল না সেইজন্যই বুঝতে পারতাম না, কীটা উড়ন্ত বাহুকে অপরিচিত পাখী বসতে সক্ষম হয়েছিল। একটা ছরবীণ পাবার জন্য তখন বেশ আগ্রহ হ'ত, কিন্তু সে বাসস্থান তাকুভাডি পরিত্যাগ করতাম। আমি জানতাম আমার আশা বাস্তবে

তব্বুরের বিলাত ব্যক্তি

কোন লাভ নেই। কারণ আমার মত লোকের পক্ষে একটা দুরবীন সংগ্রহ করা সহজ না হলেও ব্যারসাধ্য ছিল।

সমুদ্রে একরূপ দৃষ্টাবলী দেখে কয়েক দিন বেশ আনন্দেই কেটে গেল। হঠাৎ একদিন ঠিক বারটার সময় বখশ অফিসারগণ ছুপরে খাবার খেতে আসবে ঠিক তেমনিসময় জাহাজখানা মচ, মচ, করে উঠল। সেনা কোনও কিছুতে আঘাত পেয়েছে। সাগরে প্রবল ঢেউ ছিল। ঢেউগুলি কোথায় লয় পেয়ে গেল। বাইরে এসে দেখি হাড়িতে দুধ জাল দেবার সময় দুধ বেমন কেনিয়ে উঠে তেমনি কবে সাগরের জল নীচ থেকে কেনিয়ে উঠছিল আর জাহাজখানা ক্রমেই কঁপে কঁপে অতি দীর গতিতে সামনেব দিকে আগিয়ে চলছিল। ছোট বেলায় কুসংস্কার আমার বেশ ছিল কারণ সাগর সহজে আমার কোমল অভিভক্তা ছিল না। অন্তান্ত বয়দের জিজ্ঞাসা করলাম একরূপ হচ্ছে কেন রে? তারা সবাই বললে “জলদেবতা আমাদের প্রতি কুণিত হয়ে আমাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে হয়ত এবার জাহাজ ডুববে। সমুদ্র জ্ঞান আমাদের নাই তারা নিশ্চয়ই বলবে এটা জলদেবতারই কাজ। কিন্তু জলদেবতা খেলা করে শুধু মুখ ভারতবাসী এবং আববদের অন্তরেই। ইউরোপীয় চীনা অথবা আপানীদের অন্তর হতে জলদেবতার স্থান উঠে গেছে কারণ তারা এখন জেনেছে সাগরে এমন কেন হয়? বতকণ কিছুই জানা হয় না ততকণই বন দেবতা, জল দেবতা, রোগ দেবতা আমাদের মন দখল করে বসে থাকে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এমনি স্থানে এসে পৌঁছলাম যেখানে বতকণ আমাদের সাধারণ অবস্থার পরিণত হয়েছিল। বারো আড়া আড়া কতকগুলি ছোট পাহাড়, যে সকল খালসী ভরে ভীত হয়ে উঠেছে তাদের আশে পাশে জল। বাদের দুধ হতে একটা কণা বের হাছিল না

ভবযুরের বিলাত যাত্রা

আমরা এখন নানা দুর্ঘটনার কথা বলতে প্রয়াসী হলাম। জাহাজে নব জীবনের সূচনা হল। শুধু অফিসারগণের মনোর পরিবর্তন হল না। তারা এই তথাকথিত দানবের স্থানে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ যেন বেশ উৎসুক্য প্রকাশ করছিল। এখন তাদের মুখে সে ভাব নাই। তারা যেন কিছু হারিয়েছে। তারা যা হারিয়েছে, যেন কিরে পেতে চায় শুধু কতব্যের অন্তরোধে তারা এগিয়ে চলছে।

তারা কি হারিয়েছে তাই আমি জানতে চেয়েছিলাম। আমাদের লোক সে কথা কোন মতেই বলতে পারল না। মিঃ মরিসনকে বিকাল বেলা সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের লোক কি বলে? তাদের মাঝে অনেকেই বহু বৎসর সাগরে কাটিয়েছে। আমাদের লোক যা বলেছে তা মরিসনকে বললাম। মরিসন বললেন তোমাদের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কি তাই বলে? যদিও আমি জানতাম আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চন্দ্র গ্রহণ এবং সূর্য্য গ্রহণ এর সময় গম্ভীরা স্নান করে পাণ দূর করে এবং পুণ্য অর্জন করে তবুও দেশের বদনাম যাতে না হয় সেজন্য বললাম আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক জাহাজে কাজ করেনা বলেই এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মরিসন বললেন এদিকে ভূমিকম্প হয়েছে সেজন্যই বা দেখেছ তাই ঘটেছে। জাপান হতে আমরা বেশী দূরে আসিনি। জাপানের কাছে সাগরটী পৃথিবীর একটি গভীরতম সাগর। এদিকে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। সূর্যের বিষয় তোমার সর্বপ্রথম সমুদ্র যাত্রাতেই একটী বিশেষ ঘটনা ঘটল যা স্মরণ করে স্মৃতি হতে পারবে।

এই ঘটনা ঘটবার আরও সাতদিন পর আমাদের জাহাজ ফ্রান্সিসকো, লস-এন্জেলস হয়ে পানামা খালে পৌঁছল। উল্লিখিত দুই বন্দরে আমরা কেহই নামবার অধিকার পাইনি এমন কি বিধিব্যাহার

জব্বুরের বিলাত যাত্রা

নিউইয়র্ক নগরীতেও না ; সেজন্যই নতুন মহাদেশের কথা কিছুই বলতে পারলান না। এতে হুঃখিত হবার কিছুই নাই, যারা ভ্রমণ কাহিনী পড়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায় তারা ইচ্ছা করলেই বড় বড় পর্যটকদের ভ্রমণ কথা পাঠ করে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

নিউইয়র্ক হতে আমরা বোষ্টন আসি এবং সেখান থেকে আমরা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার জন্ত প্রস্তুত হই। প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেবার সময় একজন ভারতীয় খালাসী জাহাজের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে থাকে। এই লোকটি দাঁড়িয়ে দেখত, জাহাজের অগ্রভাগে কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার সময় ইণ্ডিয়ান খালাসীকে সে কাজ হতে সরিয়ে দিয়ে একজন করে ব্রিটিশ অভিসার পালাক্রমে সে কাজ করতে লাগল। অতি সাবধানতার পেছনে অতি নিশ্চয় বিপদের সম্ভাবনা ছিল। জাহাজের প্রত্যেকটি নাবিক মরণ ভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের কথাই চিন্তা করছিল। আমার সে চিন্তা ছিল। না কারণ আমি জানতাম আমার মরণ অতি সন্নিকটে। যদি জাহাজ ডুবে মরি তবে ক্ষতি কি ?

কয়েক দিন চলার পরই হঠাৎ একদিন অন্ধকার রাত্রে বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠল। প্রত্যেকেই লাইফ বয় লাগিয়ে জাহাজের বাইরে এসে স্ব স্ব নৌকার কাছে এসে দাঁড়াল। আমিও আমার নির্দ্ধারিত নৌকার কাছে এসে দাঁড়ালাম। জাহাজের উত্তর দিকটা অন্ধকার রাত্রেও বেশ আলোকিত হয়েছিল। একটা গুত্র আলো সকলের নাকে মুখে এসে পড়ায় সকলের মুখই দুধের মত সাদা দেখাতে লাগল। এবার কিন্তু আমার সাথী ভাইরা কেহই ভূত প্রেতের কথা বলল না। তারা আমাদের আনিয়ে দিল সামনেই একটা বরফের পাহাড়। এটাকে এড়িয়ে যেতে পারলেই বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। আমাদের

ভবঘুরের বিলাস বাজা

জাহাজে বাতে করে আইস্ বর্গের উপর না গিয়ে পড়ে সেজন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে ঠিক ভোরের বেলা আমরা নিরাপদ স্থানে এসে পৌঁছলাম। মরবার পূর্বে এটাও একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আঠার দিন পর আমাদের জাহাজ লিভারপুল এসে লাগল। আমাদের প্রত্যেককে ছুটি দেওয়া হল। কথা ছিল সাতদিন ছুটিতে আমরা লিভারপুল শহরটি ভাল করে দেখতে পাবব। যাব ইচ্ছা সে জাহাজে ফিরে যাবে, আর যার ইচ্ছা না হবে সে শহবেই রাত ও কাটাতে পারবে। আমার জাহাজে ফিরে যাবার মতলব ছিল না, সে জন্য জাহাজ হতে নেমেই লণ্ডনের টিকিট কিনে লণ্ডন আসলাম এবং লণ্ডনে এসে টেক্সি যোগে পপ্পলারে গিয়েছিলাম। পপ্পলারে আমার পরিচিত অনেক বন্ধু ছিলেন। তাদেরই সাহায্য নিয়ে থাকবার স্থান করে নিয়ে বাতে করে আরও কয়েকটি বৎসর জীবিত থাকতে পারি তারই বন্দোবস্তে মন দিলাম। ইংল্যান্ডে ঠো-এ-ওয়ে আইন আরোপীত হবার নিয়ম নাই কারণ গ্রেট ব্রিটেনে যে কোন দেশের লোক পা দেবা মাজ সে ব্রিটিশের মতই নাগরীর হয়ে যায়। ব্রিটিশ নাগরীক ব্রিটেনে ঠো-এ-ওয়ে হয় না। আমারও সে ভয় ছিল না, সেজন্য প্রকাশ্যেই আমি থাকতে লাগলাম এবং যে পর্যন্ত কম কষ্টতা থাকে সে পর্যন্ত বাতে আমি কাজ করতে পারি তারই চেষ্টা করতে লাগলাম।

কাজ পাওয়া গেল। কাজ মন দিয়ে করতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন মূখ দিয়ে কতকগুলি টাটকা রক্ত বেরিয়ে আসল। টাটকা রক্ত দেখে মনে হল আমার শরীর আর বেশীদিন টিকবে না। মিলখ না করে সেদিনই ক্যালিডোন হাসপাতালে ভর্তি হলো এবং সার্জিক করে রোগ জ্বলে থাকতে পারি সেজন্য নানারূপ বই পড়ে সময়

ভবঘুরের বিলাত বাজা

ক্ষেপণ করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ভ্রমণ কথাও লেখতাম। এতেই আমার দিন কেটে যেত।

দেখতে দেখতে তিনটি মাস কেটে গেল। আমার শরীর সবল হয়ে উঠলো, আমাকে হাস্পিটাল হতে ডিসচার্জ করা হল। আমি হাস্পিটাল হতে বের হয়েই সন্ন্যাসরি বৃটিশ নাগরীক হবার জন্য আবেদন করলাম। নিয়ম ছিল যে কোন বৃটিশ প্রজা গ্রেটব্রিটেনে এসে বাঃ তিনমাস থাকে এবং বৃটিশ নাগরীক হবার জন্য আবেদন করে তবে তাকে বৃটিশ নাগরীক করে নেওয়া হয়। আমিও বৃটিশ নাগরিক হয়ে পুনরায় সেই বয়ের কাজ করেই পৃথিবীটা পুনরায় চকর দিয়ে যখন লঙনে ফিরে আসলাম তখন আমার মনে একটি প্রবল বাসনা জেগে উঠল। সেই প্রবল বাসনাটি হল ভূ-পর্ষটক রামনাথ বিখাসের সংগে সাক্ষাৎ করা। পৃথিবীর প্রত্যেক বন্দরে গিয়ে তাঁর অমুসন্ধান করেছি, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাইনি, অবশেষে লঙনের গাওয়ার স্ট্রীটে এসে ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলি পাঠ করে ভারিই সন্তোষে একটি রিপোর্ট পেলাম, সেই রিপোর্টে ছিল ভূ-পর্ষটক রামনাথ বালিনে পৌঁছেছেন সত্তরই হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স হয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছবেন।

এদিকে আমার শেষ নিখাস ফেলবার সময় অতি কাছে এসেছিল। আমি আমার ডায়রীখানা অতি যত্নে কাছে রেখে ভাবতাম, ভূ-পর্ষটক রামনাথ আমার সংগে দেখা করবেনই। তিনি এসেছিলেন তাঁকে আমার ডায়রী সম্বন্ধিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন আমার ডায়রী তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন। তাঁকে আমি বিদায়ও দিয়েছিলাম। আমি জানতাম তাঁর সংগে আমার আর দেখা হবে না। তবুও খাতি পেয়ে ছিলাম আমার ডায়রী প্রকাশ পাবে

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

বলে। আমার ডায়রীর শেষ পাতায় হাসপাতালের অধ্যক্ষগণকে লক্ষ্য করে লেখেছিলাম গরীবের দান করার মত অনেক কিছু আছে, সারা-জীবনের পরিশ্রম, গরীব সমাজের কল্যাণে অকাতরে দান করে, আমি তাই করেছি, এমন মরণের পরও কিছু সমাজ দান করা যায় কি না তাই অনেক দিন ভেবে ঠিক করেছি, আমার মরার পর আমার শরীর ধর্মমতে নষ্ট না করে সমাজের ডাক্তারদের দেওয়াই উচিত। ডাক্তারগণ আমার শরীর নিয়ে গবেষণা করবে এবং যাতে পৃথিবী হতে ক্ষয়রোগ লোপ পায় তারই চেষ্টা করবে।” এর পর গরীব মজুরের সমাজকে দেবার মত কিছুই থাকবে না।

—শেষ—

চাকুরিয়া (২৪ পরগণা) হইতে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত
ও উৎপল প্রেসে শ্রীঅনিল কুমার বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত।